চতুর্থ অধ্যায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা ও রাজনীতি

চতুর্থ অধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতা ও রাজনীতি

আমরা জানি সমাজ কল্যাণকামী ও জীবনসন্দীপী সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে সাহিত্যিককে হতে হবে সুন্দর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে যদি তিনি একাত্মতা অনুভব করতে না পারেন, তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির আলো ফেলে যদি জীবনের কুশ্রীতার মধ্যেও সুশ্রীকে আবিষ্কার করতে না পারেন, তবে যে সাহিত্য কালজয়ী হয়ে ওঠে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ 'ঐকতান' কবিতায় লিখেছেন ''জীবনে জীবন যোগ করা না হলে,/কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।''[১] সাহিত্যিক যখন হন দরদী অন্তঃকরণের অধিকারী তখনই তিনি মানব মনের গহন রহস্যকে আবিষ্কার করতে পারেন। আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় ওরা সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের প্রতিরূপকে তুলে ধরে শিল্পরসসৃষ্টি করাই হয় তাঁর লক্ষ। কিন্তু এই রসসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে তুলে ধরতে হবে এমনভাবে যাতে মানুষ জীবনে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা পায়। এই জীবনসন্দীপী সাহিত্যের সার্থক রূপ আমরা পাই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসগুলির মধ্যে।

(ক) 'ঘুণপোকা'

বাংলা ও বাঙালির সমাজজীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথা মর্মবিদারক ঘটনা হল ১৯৪৭-এর দেশভাগ। স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যখন ভারতবর্ষকে দুটুকরো করা হল ভারত এবং পাকিস্তান নামে, তখন বাংলার একটি বৃহৎ অংশও খণ্ডিত হয়ে যুক্ত হল পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তান নামে। পরবর্তীকালে যার নাম হয়েছে বাংলাদেশ। এর আগেও অবশ্য আরেকবার দুই বাংলা পৃথক হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ করে একটি অংশ অন্য প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিল তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকার। কিন্তু সমকালীন বাঙালি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বেরা এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। সমস্ত বাঙালির এই সম্মিলিত বিরোধ ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করেছিল বঙ্গভঙ্গ 'রদ' করতে।

কিন্তু ১৯৪৭-এ রবীন্দ্রনাথ নেই, নেই বাঙালির সেই ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। তা ছাড়া ভারতবর্ষের জাতীয় স্তরের নেতারাও তখন দেশ বিভাজনের পক্ষে। এমন অবস্থায় রেডক্লিক এর চালানো ছুরিতে ভাগ হল জমি, তৈরি হল নতুন দেশ, বিভক্ত হল বাঙালি সমাজ। কবির ভাষায় 'প্রদেশ' ছিল হল 'পরদেশ'। জাতিদাঙ্গায় শুরু হল মহাবিনাশের। লক্ষ লক্ষ লোক স্বজনহারা হলেন। নিজের ভূমিতেই হলেন উদ্বাস্তু। মানবজীবন ও সমাজে আরম্ভ হল নতুন সমীকরণ।

বাংলা তথা ও বাঙালি সমাজের ভাঙাগড়ারী এই চরম অভিজ্ঞতা ও দুই বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীকালে সারা দুনিয়ার অর্থনীতিতে যে ব্যাপক পালবদল ঘটে তার ফলশ্রুতিতে সমকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ তীব্র সংকটের মুখোমুখি হয়। সমাজজীবনের এই সংকট বাংলা উপন্যাসে নায়কের বিবর্তনে লক্ষণীয় বদল ঘটায়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে মানুষ ও ব্যক্তির অস্তিত্বে অর্থানুসন্ধান প্রয়াস, তার সন্দেহ, শঙ্কা-শঙ্কামুক্তির দিক প্রভৃতি নিয়েই 'ঘুণপোকা' (১৯৬৬) উপন্যাসে শ্যাম চরিত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তার ওপর মূলত সমসময়ের সমাজেরই আলোর প্রতিফলন ঘটেছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ 'ঘুণপোকা'র শ্যামের সমসাময়িক শিক্ষিত যুবকের অন্তরবেদনার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন — ''বিচ্ছিন্নতার ভাবনা আবেগধর্মী উনিশ শতকে ছিল না, থাকার কথা নয়। বিচ্ছিন্নতা বিশ শতকেরই ক্রমশ তৈরি হওয়া একটা জটিল অসুখ। দুটি যুদ্ধ তার জন্ম দেয়, লালন পালনে সহায়ক হয়। মানুষ সমষ্টির সঙ্গে যোগেই পূর্ণ। তা থেকে সরে এলেই মানুষ একা, নিঃসঙ্গ, শূন্য। কিন্তু সময় এই মহৎ ভাবনার মূলে ভয়ঙ্কর আঘাত হেনেছে বলেই মানুষ তার সমষ্টির সঙ্গে আত্মীয়তার কথা ভুলে যায়, বাধ্য হয় ভুলে যেতে। যেন তার মাথায় 'সিজোফ্রেনিয়র মত বিস্মরণ জনিত অসুস্থতা দেখা দেয়। সত্তরের দশকের কালে গোষ্ঠী জীবনে অভ্যস্ত মানুষদের মধ্যে সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব এক শক্তিত শূন্যকে বুকের গভীরে অনুভব করে। তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বিধ্বস্ত। শ্রদ্ধা নেই অতীতের প্রতি, বিশ্বাস নেই ভবিষ্যতে। দুর্বোধ্য বর্তমানের গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়াই এদের অদৃষ্ট।''[২] সত্তর দশকে উপন্যাসে এমন নায়কের সাথেই পরিচয় ঘটায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' উপন্যাসের শ্যাম।

শীর্ষেন্দুর প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা' যখন প্রকাশ পায় তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি নতুন পথে বাঁক নিয়েছে। রাজনীতির জগতে কংগ্রেসের স্বপ্ন হঠাৎ এক নতুন বাস্তবের সঙ্গে সংঘর্ষে হোঁচট খেয়েছে। স্বপ্নোত্থিত রাষ্ট্রনায়কের আশাভঙ্গের প্রথম আর্তনাদ সেদিনের যুবমানসে নানা প্রশ্ন জাগিয়েছিল। 'ঘুণপোকা' রাজনৈতিক জিজ্ঞাসায় কণ্ঠকিত নয় একেবারেই। 'ঘুণপোকা'র শ্যামের জন্ম স্বাধীনতার আগে। শ্যাম লেখকেরই সমবয়সী। এক তেইশে ডিসেম্বর কর্মচ্যুত শ্যামের

''একত্রিশের জন্মদিনে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হচ্ছিল। তার এমনও মনে হচ্ছিল যে আজকের দিনটা বোধহয় ভালই কেটে যাবে।''[৩] শ্যাম জানে ভবিষ্যৎ চিন্তা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। শ্যাম ব্যক্তি স্বাধীনতাকেই শুধু স্বাধীনতা বলে ভাবতে পারে, অথচ নতুন ভাবনার পথ ধরে ৬৭-র পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন তাকে স্পর্শ করেনি। স্বয়ং লেখকও রাজনীতি-সচেতন অথচ রাজনীতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। যোগীপুরুষের ন্যায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে আত্মমগ্নতা ও অস্তিত্বের প্রশ্নচিহ্নকে বাস্তবায়িত করে সমকালীন যুগজীবনের সমস্যাকে অপূর্ব শিল্পরূপ দান করেছেন।

উপন্যাসে শ্যাম চক্রবর্তী যেমন 'আমি কে?' অস্তিত্ব সম্পর্কিত এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে অন্তরমুখীন হয়েছে। হয়েছে অতীতচারী অপরদিকে তাঁর সৃষ্ট অরুণ চরিত্রটি স্ব-অস্তিত্বে ঠিকে থাকার জন্য নীতি ভ্রষ্ট হয়েছে ও সমৃদ্ধি লাভের আশায় দ্বিচারী জীবন অবলম্বন করেছে। আমরা জানি ''মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশ বড়ো একটা অংশ তাঁদের দিয়ে গড়া যাঁরা অনেক আগে থেকেই ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়ে শহরে এসে বেতনভুক্ত অথবা বৃত্তিজীবী হয়ে পড়েছিল। জীবিকার টানে শহরবাসী হয়ে ওঠা, এটা ইংরেজ আমলের আগে থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে শুরু হয়েছিল। আগে অবশ্য কম, ইংরেজ আমলে অনেক বেশি। মোগল শাসনের গোধূলিবেলায় একেবারে শায়েস্তা খাঁর আমল থেকেই কিছু কিছু রাজপুরুষের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের পথ অবলম্বন করলে বাংলার স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামজীবনে একটা বাইরের ধাক্কা এসে লেগেছিল। শুধু তা-ই নয়, এই সূত্রে এদেশের গ্রামীণ স্ব-সংবদ্ধ অর্থনীতির পাশাপাশি একটা ভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক অর্থনীতির পত্তন হতে শুরু করেছিল। কেন্দ্রীয় শাসন যতই দুর্বল হতে লাগল এইসব ব্যক্তিগত মুনাফাদারিও ততই বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে স্থানীয় দালাল গোমস্তা কর্মচারী কেরানির সংখ্যাও ততই বাড়তে লাগল। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে এবং তার পরে আলিবর্দি খাঁর আমলে রাজদরবার এবং রাজপুরুষদের প্রকাশ্য ও গোপন ব্যবসাপত্রকে আশ্রয় করে যে কর্মচারী ও করণিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার আয়তন খুব ছোটো ছিল না। পলাশির যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই কলকাতাতে ইংরেজের আশ্রয়ে অনুরূপ একটি কর্মচারী ও করণিক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছিল। বণিকের মানদণ্ড যেদিন রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল তারপর থেকে কলকাতার বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় এবং পরে অন্যান্য শহরে এই গোষ্ঠীর আয়তন ক্রমেই স্ফীত থেকে স্ফীততর হতে লাগল।''[৪] এইরকমই এক গোষ্ঠীর সদস্য উপন্যাসে অরুণ চরিত্রটি।

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তঃর্গত এই কর্মচারী ও করণিক গোষ্ঠীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচক আরও বলেছেন — ''এই গোষ্ঠীর উপরের দিকের এবং নীচের দিকের দুই দরজাই

খোলা। উপরেদিকের দরজা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ, নীচের দিকের দরজা প্রশস্ত। উপরের দিকের দরজা দিয়ে মধ্যম স্তরের মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্তে পরিণত হয়। সরল অথবা বক্র পথে বেশি আয়ের সুযোগ পেয়ে, উচ্চপর্যায়ের কর্মচারী হবার পথ সুগম করে।"[৫] উচ্চপর্যায়ের কর্মচারী ও চাকরির স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষার অরুণ তাঁর বসের কন্যার সাথে প্রেমহীন সম্পর্ককে প্রেমঘটিত বিবাহে পরিণত করে। কৃতকর্মের জন্য অরুণের স্বীকারোক্তি ''শালার বস ছিল তেরিয়া, তাই বাঁচার জন্য একদিন তার কালো-কুচ্ছিত মেয়েটাকে নিয়ে লম্বা দিলুম। লোকটা চেঁচামেচি করল বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত মেনেও নিল। দুটো লিফট পেলুম পর পর। একটা দুঃখ ভাই, ছেলেবেলা থেকেই একটা সুন্দর বউয়ের শখ ছিল আমার। সেটা হল না। বলতে বলতে মৃদু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে অরুণ, তবে পুষিয়ে নেব, দেখিস। ফেব্রুয়ারিতে চললুম আমেরিকা... বউকে রেখে যাচ্ছি তার বাপের বাড়িতে...।"[৬] প্রেম নয়, আদর্শ নয় কেবল স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকা এবং কর্মজীবনে লিফট পেয়ে ওপরে ওঠা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি শিক্ষিত যুবাপুরুষের এই আকাঙ্ক্ষা সমাজ জীবনে অবক্ষয়ের সূচনাকেই ইঙ্গিত করে। প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনে ক্লান্ত অরুণ আবার ক্ষণিকের প্রশান্তি লাভের আশায় লীলার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। বিদেশে গিয়ে ওপেন সেক্সচুয়াল লাইফকে এনজন করার স্বপ্ন দেখে। প্রয়োজনের জগৎ ও অনুভবের জগতের মধ্যে নিজেকে বাটোয়ারা করে এই যে চলার নীতি তা নিতান্তই আমাদের সমাজের উপর বিশ্বযুদ্ধের বিষক্রিয়ার চরম ফল।

জীবনবোধের গভীরতাহীন সহজ সরল চরিত্র সুবোধ মিত্র কিন্তু সামাজিক কর্তব্য পালনে তার গভীর হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়েছে। সৎ ভাই বোন ও পিতার দ্বিতীয়পক্ষের সংসার প্রতিপালনে ব্যস্ত সুবোধ মিত্রর কর্তব্যপরায়ণতা স্বার্থপরতায় দীর্ণ পৃথিবীতে আমাদের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার চল্লিশ বছর বয়সেও সুবোধ মিত্র বিয়ে করার জন্য বয়স ভাঁড়িয়ে কথা বলে শ্যামের সাথে। আমাদের সমাজে বিবাহ একটি অতিসিদ্ধ সামাজিক প্রথা। বিবাহসূত্রে আবদ্ধ নরনারী পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই করার শক্তি পায়। বিবাহ দেয় সন্তান। সন্তানের মধ্য দিয়ে পুরুষ নবজন্ম লাভ করে। এই সামাজিক সত্যকে স্বীকার করে সুখী সংসারী জীবনযাপনের স্বপ্ন নিয়ে সুবোধ মিত্র বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবার জন্য স্বপ্ন দেখে। এহেন সহজসরল প্রথাগত জীবনাচরণে অভ্যস্ত সুবোধ মিত্র যখন মায়ের ঘুমের ওষুধ লুকিয়ে সরিয়ে রাখে প্রয়োজনে কাজে লাগাবার জন্য তখন আমাদের বুঝে নিতে হয় পৃথিবীর (সমাজের) গভীর গভীরতর অসুখ আজ। যে অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে শ্যাম চক্রবর্তী জর্জরিত, দিশেহারা, অস্তিত্ব সংক্রান্ত দ্বিধা অরুণকে দ্বিচারী করে তুলেছে, অস্তিত্ব সংক্রান্ত সেই মৌলিক প্রশ্নই সুবোধ মিত্রকে মৃত্যুবান স্বরূপ ঘুমের ওষুধের সঞ্চয়ে উৎসাহী করে তুলেছে। আধুনিক সভ্যতার

সাজিয়ে তোলা সমাজে অস্তিত্বের ঘুণপোকা কমবেশি সকলকেই অন্তঃসারশূন্যে পরিণত করেছে। তার হাত থেকে যেমন রক্ষা পায়নি অন্তরমুখীন চরিত্র শ্যাম, তেমনি মুক্তি পায়নি 'রাফ এন্ড টাফ' চরিত্র অরুণ এবং গতানুগতিক মধ্যবিত্ত পুরুষ সুবোধ মিত্রও। অস্তিত্ব সংক্রান্ত এই যন্ত্রণা উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পুরুষের 'কমন' সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

উপন্যাসে অন্ধকার জগৎ থেকে ওঠে আসা চরিত্র মিনুর উপস্থিতি সমাজে আলোর পাশাপাশি অন্ধকারের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করেছে। একদিকে দেশভাগ ও বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ফলাফল অন্যদিকে জনস্ফিতি ও বেকারসমস্যা শিক্ষিত বাঙালি যুবসম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল। বেঁচে থাকার আশায় দিগভ্রান্ত যুবকরা অনেক সময় অন্ধকার পথকেই অঙ্গিকার করে নিয়েছে। যদিও উপন্যাসে মিনুর মস্তান হয়ে যাবার কোন স্পষ্ট কারণের উল্লেখ নেই। যে মিনু শ্যামকে পকেটমারদের হাত থেকে রক্ষা করে অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই মিনুই আবার কেন কোন অপরাধে শ্যামকে মারল তার কোন উত্তর স্পষ্টভাষায় উপন্যাসে নেই।

(খ) 'পারাপার'

'পারাপার' উপন্যাসে রাজনীতির কথা এসেছে চরিত্রের অন্যতম পরিচয় রূপে। আর সে রাজনীতি কাহিনির মধ্যেও ব্যাপ্তি পেয়েছে। একদা কলেজের কম্যুনিস্ট ছাত্র নেতা ললিত ক্যানসার রোগাক্রান্ত। '' 'ঘুণপোকার' এককেন্দ্রিকতা এই উপন্যাসে নেই, অনেকগুলি চরিত্র ও ঘটনার ছোট ছোট বলয় একে অপরকে স্পর্শ বা ছেদ করে। আর ললিতের সুনিশ্চিত মৃত্যু চিহ্নিত জীবন অতীত ও বর্তমানের দোলায় পাক খেতে খেতে বৃহত্তর দিকে অগ্রসর হয়।''[৭] সাথে সাথে সঞ্জয়-আদিত্য- তুলসী-শাশ্বতী- বিমান-অপর্ণা- রমেন প্রভৃতি চরিত্রগুলি সত্তর দশকের বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে যে সমকালীন সমাজজীবনকে পুরোপুরি বুঝে নিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

বিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের বাংলা কথাসাহিত্যের পটভূমি বর্ণনা করতে গিয়ে সাহিত্য সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত তাঁর 'বাংলা কথাসাহিত্যের একাল' গ্রন্থে বলেছেন — ''১৯৬৬-র পর পশ্চিমবঙ্গের সমাজ যেভাবে উত্তাল সময়ের জন্ম দিয়েছে তাতে কথাকার যদি সমাজ সচেতন হন, কোনক্রমেই সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। গভীর প্রোথিত হতাশা ও বড় আশা নিয়েই এসময়ের মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের দিকে সামিল হয়। আর এই মধ্যবিত্তরাই হয় কথাকারদের বিষয়ভাবনার বড় আধার। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার'-এর ললিত সেই মধ্যবিত্তই। কমিউনিস্ট মতবাদের সংঘাত, কংগ্রেসের ভাঙন, নকশালপন্থীদের আবির্ভাব,

জরুরি অবস্থার রুদ্ধশ্বাস অবস্থা — এই সমস্ত ঘটনা সমকালীন সমাজ ও সময়কে এমনভাবে চকিত ও দীপ্ত, গতিশীল ও রুদ্ধশ্বাস করে যে সচেতন লেখকমাত্রই তার অনুগত হতে বাধ্য। কারণ এসবের সঙ্গে বিরাট উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত শ্রেণি ও কৃষকশ্রমিকের জীবনধারণের সম্পর্ক জড়িত। এসবের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তির সংকটের জন্ম তাই-ই লেখকের ললিত চরিত্র কল্পনার উদ্দীপন বিভব।"[৮] শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর একমাত্র অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উত্তাল সময় ও সময়ের এবং ব্যক্তির সঙ্কটকে ললিত চরিত্রে মাধ্যমে উপন্যাসে আনলেও রক্তাক্ত সময়ের ক্ষতবিক্ষত অভিজ্ঞতা ললিত চরিত্রের পদক্ষেপকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করেনি। ক্যানসার রোগাক্রান্ত মৃত্যুপথযাত্রী ললিতের জীবনে অস্তি'র বোধ 'নাস্তি'র দ্বারা খণ্ডিত নয়। অপর্ণার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় রাজনীতি নিয়ে। রমেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরির শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কে ললিত নিঃসন্দেহ, যতই অপর্ণা রমেনের প্রজাদের প্রতি ভালোবাসার ব্যাপারটা বড় করে দেখাক। অপর্ণা বিশ্বাস করে ''মানুষ ভাতকাপড়ের চেয়েও মানুষের ভালবাসা বেশি চায়।"[৯] বস্তুত ললিত আর অপর্ণার কথায় এসে গেল ব্যক্তির সঙ্গে শ্রেণির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ। লেখকের নিজের বিশ্বাস 'একক'-এর সামর্থ্যে। তাই তিনি রমেন সম্পর্কে বলেছেন ''মানুষের মাথার চারদিকে জ্যোতির্বলয় নেই— এতো ঠিক কথাই। কিন্তু কাউকে কাউকে দেখলে মনে হয়, এর মাথায় চারদিকে ওরকম অদৃশ্য কিছু একটা রয়েছে।"[১০]

মৃত্যুচিন্তা, রমেনকে কেন্দ্র করে hallucination, কখনও 'মা' কে কেন্দ্র করে নস্টালজিয়া। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেন অকস্মাৎ চতুর্দিক চমকে দিয়ে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসে। একদিন মরণ আঘাতে 'ঘুণপোকা'র শ্যাম বড় মায়ায়, বড়ো ভালোবাসায় পৃথিবীর ধুলোমাটিকে আঁকড়ে ধরেছিল আর 'পারাপার' এর ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ললিতের কেবল ইচ্ছে করে আর একবার শিশু হয়ে এই মায়ের কোলে ফিরে আসতে। মাকে আর কত ভালোবাসার ইচ্ছে ছিল তার। ''অদুরাগত মৃত্যু ছায়া ফেলে ললিতকে অতৃপ্ত রেখে। আর অন্যদিকে নতুন প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় তুলসীর স্ত্রী মৃদুলার গর্ভে। দু-হাতে অন্ধকার কাটিয়ে এক প্রতীক্ষার প্রাণদায়ী সম্ভাবনা যেন শোনায় 'শত শত জলঝর্নার ধ্বনি।' উপন্যাসের কেন্দ্রে ছিল ললিত, কিন্তু ললিত যে আকাশভরা অবকাশ রচনা করে যাবে মৃদুলার সন্তান তা পূরণ করে দেবে। হারানো অতীতের জন্য নস্টালজিয়া আর ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্পন্দন পাঠককে পৌঁছে দেয় 'উজান' পথে।"[১১]

দেশভাগ ও তৎজনিতকারণে ছিন্নমূল হয়ে যাবার করুণ অভিজ্ঞতাকে বুকে লালন করেও সর্বসহা মাতৃরূপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ উপন্যাসে ললিতের মা। তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজব্যবস্থায় নারীরা প্রায় অন্তঃপুরবাসিনী ছিল। সংসার সেবাই তাদের একমাত্র ধর্ম ও কর্ম ছিল। তখনও উপার্জনশীল, রাজনীতি সচেতন আধুনিক নারীর আবির্ভাব বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে ঘটেনি।

তাই ললিতের মায়ের কাছে দেশভাগের অর্থ কেবল পূর্ববঙ্গের ভিটে ছেড়ে তাদের পশ্চিমবঙ্গে নতুনভাবে নতুন ভিটেতে দিনযাপন ও পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি, পরিচিত মানুষজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হবার স্মৃতিভরা বেদনা। ১৯৪৭ এর দেশভাগের পিছনে রাজনৈতিক কার্যকারণ, ১৯৬৬-র পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতির উত্তাল পরিস্থিতি এসব তাকে ভাবিত করে না। পুত্র ললিতকে নিয়ে ছোট গৃহকোণে আবদ্ধ ললিতের ''মা শুধু জানে যে, তার (ললিতের) গুরুতর একটা কোনও অসুখ করেছিল এখন সেরে গেছে।''[১২] তাই অবোধ মাতৃহৃদয় ছেলের আরও সুস্থতার কামনা করে শম্ভুকে বলে ''নিয়ে যাস তো শম্ভু, আমি ওকে রোজ রাত থাকতে তুলে দেব। জোয়ান বয়সের ছেলে দেখ, রাতে নাকি ঘুম হয় না, সকাল আটটার আগে উঠতে পারে না, একটু বেশি ভালমন্দ খেলে সইতে পারে না। তুই নিয়ে যাস তো। না যায় তোর বন্ধুদের বেঁধে এনে জোর করে নিবি। দেতো ওর সব অসুখ সারিয়ে।''[১৩] মৃত্যুর আগের পুত্র ললিতকে সংসারী করে যাওয়াই হল নিম্নমধ্যবিত্ত এই নারীর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। নিম্নমধ্যবিত্ত সুলভ দীনতা, ক্লান্তিকর জীবন ললিতের মাকে ক্লিষ্ট করে না। তার সহজাত নেতৃত্ব প্রবণতার গুণে সে পাড়ার 'লিডার বুড়ি'তে পরিণত হয়। এইসব ছোটখাটো প্রাপ্তিতে পরম শান্তি পায় খিড়কি থেকে সিংহ দুয়ারের সীমায় বদ্ধ নারী ললিতের মা। ললিতের বন্ধু সঞ্জয়ের গাড়ি দেখে গাড়িতে করে কালিঘাট, দক্ষিণেশ্বর যাবার বাসনার প্রকাশের মধ্যে যেন ললিতের মায়ের এক অপার্থিব কোন বস্তুকে কামনা করার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এইরূপ স্বল্প সন্তুষ্ট সাংসারিক সীমায় বদ্ধ নারীই শাশ্বত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের ধারক।

''প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বাঙালির উপর দিয়ে একটার পর একটা দুর্যোগের ঝড় বয়ে গেছে। এই ঝড়ের বেগে বাঙালির সমাজজীবনের চালা ঘরটিও ভেঙে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সমাজজীবনটি ভাঙল এবং তারই সঙ্গে বাঙালির মানবীয় সত্তায় বিপর্যয় দেখা দিল। একদিকে সামাজিক বাঁধন ছিঁড়ল, সমাজের রীতিনীতি ভাঙল, অন্যদিকে অন্তরের সম্পদ, জীবনের মহৎ মূল্যবোধ, শ্রেষ্ঠতম আদর্শ-ভাবনা থেকে বাঙালি ভ্রষ্ট হল। আদর্শের উচ্চকোটি থেকে জীবনদৃষ্টির এই স্খলনই হল আধুনিক যুগের সবচেয়ে বড় অভিশাপ।''[১৪] যুগের এই অভিশাপকেই অন্তরে ধারণ করে এক অভিশপ্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে 'পারাপার' উপন্যাসের সঞ্জয় চরিত্রটি। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ আবার অর্থনীতির মানদণ্ডে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। একটি উচ্চমধ্যবিত্ত অন্যটি নিম্নমধ্যবিত্ত। এই দুটি শ্রেণির মধ্যে অবস্থানগত পরিবর্তন এমন কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে উচ্চমধ্যবিত্ত খুব সহজেই নিম্নবিত্তের সীমায় নেমে আসতে পারে আর নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের কোন সদস্য উপরে উঠে আসতে পারে কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে। সঞ্জয় তার সততা, কর্মক্ষমতা নিষ্ঠা এই তিন চারিত্রিক গুণাবলীকে অবলম্বন করে তীব্র

প্রতিযোগিতার পথ ধরে উচ্চমধ্যবিত্তে উত্তীর্ণ হবার লড়াইয়ে সামিল হয়। তাই ''বিছানা ছাড়ার পরও আড়মোড়া ভেঙে, হাই তুলে বা ঘুমের আমেজকে বজায় রাখতে গিয়ে সে সময় নস্ট করে না। সে অনেকটা ঘড়ির অনুশাসন মেনে চলা মানুষ। কাজের লোক। সবসময়ে নিজেকে যে কোনও কাজের জন্য তৈরি রাখা তার প্রিয় অভ্যাস। তাতে মানুষ অহংকারী না হয়েও নিজেকে গুরুত্ব দিতে শেখে।''[১৫] এইভাবে নিজেকে অত্যধিক গুরুত্ব দিতে দিতে এবং লালসাকে প্রসারিত করতে করতে একদিন সঞ্জয়ের সততা ও নিষ্ঠার অবসান ঘটে যায়। মানবিকতা হৃদয়বত্তার পরিবর্তে যান্ত্রিকতা, কটুভাবনা চরিত্রে পাকাপাকিভাবে স্থান করে নেয়।

সঞ্জয় চরিত্রের এই নৈতিক অধঃপতন তার চারিত্রিক স্খলনকে আহ্বান করে আনে। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখী গৃহী সঞ্জয়ের মনে প্রশ্নের উদয় হয় ''রিনি কি কিছু কম দিতে পারে? তবু কেন যে মনে হয় রিনি যা পেয়েছে তার অনেক বেশি রিনির আছে যা তাকে দেয়নি।''[১৬] এই অদ্ভুত অতৃপ্তি জনিত হতাশা সঞ্জয়কে মিস দাশগুপ্ত অভিমুখী করে তুলেছে। সততার অবসানের মাধ্যমে যে সঞ্জয়ের নৈতিক পতনের সূচনা চারিত্রিক ভ্রষ্টতা তার সেই পতনকেই চরম রূপ দিয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে সফল হবার ইঁদুরদৌড়ে সামিল হয়ে সঞ্জয় বাহ্যিক সাফল্য পেলেও যান্ত্রিকতা ও কৃত্রিমতার চাপে রুদ্ধশ্বাস সঞ্জয় নতুনত্বের সন্ধানে, বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষায় মিস দাশগুপ্তের কাছে আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু সঞ্জয়ের নিজেরই আবার প্রশ্ন 'নাকছাবি পরা ওই মেয়েটা— ওর কী আছে? ওকে নিয়েই বা কী করবে সঞ্জয়? ... কিছুই করবে না সঞ্জয়, কেবল এই আলসেমিটুকু কাটানোর জন্য, এই একঘেয়ে টাকা রোজগার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একটু টিজ করবে।''[১৭] এইভাবে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর গতিময়তা সততা, নিষ্ঠা, প্রেমের একমুখীনতা প্রভৃতি গুণাবলী যা মানুষের সৎ জীবনযাপনের অবলম্বন তাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে সমাজে স্বার্থপরতা, প্রেমহীনতা, অসহনীয়তা মৎসন্যায়ের রূপ ধারণ করতে সচেষ্ট হয়ে সমগ্র জাতির জীবনাচরণকে বিপর্যস্ত, বিধস্ত করে তুলেছে।

উপন্যাসে এক শিল্পাশ্রয়ী একান্নবর্তী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আদিত্য। এদেশে বাণিজ্য ও শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয় ইউরোপীয়দের আগমনের পর থেকে। এই শিল্পাশ্রয়ী মধ্যবিত্ত বা বেনিয়ান সম্প্রদায়ের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৌভাগ্যের দরজা খুলে দেয়। যুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের সময়ে কালোবাজারি করে বিপুল অর্থের মালিক এই সম্প্রদায় শিক্ষা সংস্কৃতির দিক থেকে পশ্চাৎপদই থেকে যায়। কেবল অর্থ উপার্জন ও অর্থ সঞ্চয় এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ হয়। বিংশ শতাব্দীতেও এইসব বেনিয়ান পরিবারগুলির কোন কোনটিতে মধ্যযুগীয় রীতিনীতি বর্তমান। আদিত্যর পরিবার তার অন্যতম প্রমাণ।

শুধুমাত্র বেনিয়ান বিত্তিই নয় আদিত্যর পরিবার আবার অন্যদিক থেকে ছিল একান্নবর্তী। ''একান্নবর্তী ব্যবস্থার নিশ্চয়ই অনেক গুণের দিক ছিল। কিন্তু দোষের দিকও কম নয়। শুধু আলস্যের প্রশয়, কর্মবিমুখতা ও মানবশক্তির অপচয়ই নয়, আরো নেতিবাচক অনেক দিক তার আছে। পুরনো একান্নবর্তী পরিবার একনায়কত্বের পরিবার তা অ-গণতান্ত্রিক ও বশ্যতার সংস্কারের জন্ম দেয়। তা রক্ষণশীলতা ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার আধার। শুধু অর্থনৈতিক নয়, অনেক নৈতিক ও মানবিক স্খলন তার রন্ধে রন্ধে রক্ষিত হয়।''[১৮] তাই আদিত্যের ''মায়ের হাঁটুর কাছে বাবার চটিপরা পা নড়ে''[১৯] আর তার বাবা বসে থাকে কাঠের জালিকাজ করা সিংহাসনের মতো দেখতে প্রকাণ্ড গদিওলা চেয়ারে। দুশো বছরের এই পুরানো দৃশ্য আদিত্যর পরিবারের নিত্যদিনকার বাস্তব ছবি। আবার এই আদিত্যর বাবাই তার খদ্দেরদের 'বাবু' বলে সম্মানিত করে। নতশিরে কথা বলে তাদের সাথে। পিতার এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে আদিত্যর মন।

আদিত্যর এই বিদ্রোহী মনোভাবের কারণ তার প্রথাগত শিক্ষা ও ললিতের মতো কমিউনিস্ট মনস্ক ও রমেনের মতো প্রজাবৎসল জমিদার পরিবারের সদস্যের সাহচর্য লাভ। একদিকে তার সহজাত প্রবণতা ও পারিবারিক শিক্ষা অন্যদিকে বিংশ শতাব্দীর সংস্কারহীন উদারমনস্কতা আদিত্য চরিত্রকে দ্বিধান্বিত করে তুলেছে। আদিত্যর ''সবসময় সন্দেহ, ললিত যেন তাকে কোথায় হারিয়ে দিয়ে রেখেছে, কিংবা রমেন বুঝি জন্ম থেকেই মহাপুরুষ, যার নাগাল তার সাধ্যাতীত। ওইসব সন্দেহ তাকে কুরে কুরে খায়।''[২০] তার এই সন্দেহপ্রবণ মানসিকতা তার প্রেম সম্পর্ককেও কলুষিত করেছে। আদিত্যর ধারণা তার প্রেমিকার সাথে তার জাতে মেলে না। প্রেমিকা শাশ্বতীর সাথে জাতে মেলে বন্ধু ললিতের। শাশ্বতীর সাথে নিজের জাত মেলাবার অঙ্গিকার নিয়েই ঘর ছাড়ে আদিত্য। কিন্তু একান্নবর্তী বেনিয়ান পরিবারের সন্তান আদিত্যের মানসিকতার ভিত্তি রচিত হয়েছিল পারিবারিক পরিমণ্ডলে। যেখানে গৃহকর্তার মতামতই শেষ কথা। ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে অভিধানের অন্তর্ভুক্ত একটি শব্দ ছাড়া কিছু নয়। ফলে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তার প্রয়োজন সেরকম শক্ত ভিত্তির উপর চরিত্রটি স্থাপিত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ''দিনের শেষে নিরাপদ আশ্রয় বাগবাজারের সেই দূর্গের মতো বাড়িখানায় আর ফিরে যেতে পারবে না— অবচেতন মনে এই চিন্তাই তাঁকে ভীতু আর অস্থির করে তুলেছে।... সে কি পারবে নিজস্ব চাকর ছাড়া? সে কি পারবে নিজস্ব আলাদা ঘর, রোজ চাদর বদলানো বিছানা, শোওয়ার আগে এক গ্লাস দুধ ছাড়া? ..... নিজের সম্বন্ধে এইসব অনিশ্চয়তা তাকে আরও অস্থির করে তুলেছিল সকাল থেকে।''[২১] এই অস্থির আদিত্যর দ্বিধান্বিত মনে প্রশ্নের উদয় হয় ''সেই কলেজ জীবনে কেন ললিত তাকে শেখাতে গিয়েছিল সাম্যবাদ। যদি না শেখাত তবে আজ সংস্কারবশতই সে তার লোভী

স্বার্থপর বাবাকে একরকম করে মানিয়ে নিতে পারত। কেন বিষ ঢুকিয়েছিল ললিত?"[২২] এ হেন আদিত্য যে পুন মুষিকভব হয়ে পারিবারিক পরিমণ্ডলে আশ্রয় নেবে সেটাই স্বাভাবিক। উপন্যাসে আদিত্য শাশ্বতীর রেজিস্ট্রিবিবাহের দিন শাশ্বতীর আদিত্যকে বিবাহ করতে অস্বীকার করে যেন আদিত্যকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পায় শাশ্বতী নিজেও। কারণ ছিন্নমূল পরিবারের লড়াকু মানসিকতার শাশ্বতীও ততদিনে বুঝে গেছে আদিত্যর সঙ্গে সত্যিই তার জাতে মেলে না। বণিদিয়ানার সুবিশাল দূর্গে আবদ্ধ হয়ে অলস, নিরুৎসাহী, নিরুপদ্রব সংসার জীবনযাপনেই আদিত্যর মুক্তি।

নিরুপদ্রব সংসার জীবনযাপনে আকাঙ্ক্ষী উপন্যাসে তুলসী চরিত্রটিও। পেশায় স্কুল শিক্ষক তুলসী কোলকাতার নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হলে পেশাগত কারণে বাধ্য হয় গ্রামজীবন ও গ্রাম্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসতে। বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙালি সমাজে যে শিক্ষক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল তাঁদের বেতন কম কিন্তু তাঁরা ছিল শিক্ষিত, ভদ্র ও আদর্শবান মানুষ। এঁদের অনেকেই শিক্ষাদানকে জাতি গঠনের অঙ্গ হিসাবে নিয়েছিল। উপন্যাসে তুলসী চরিত্রটিও আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষকসুলভ ভদ্রতা ও আদর্শপরায়ণতা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু লেখকের অনুসন্ধানী মন বিশ শতকের পরিবর্তিত পটভূমিতে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত এবং বাধ্য হয়ে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে নেওয়া তুলসী চরিত্রের অন্তর স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন। আর তখনই ধরা পড়েছে ভীতু, কর্তব্যপরায়ণ, হৃদয়বান তুলসীর অন্তঃরালে অপর এক লোভী স্বার্থপর, বিবেকহীন তুলসীর অস্তিত্ব। যা একান্তভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দান।

কাজের থেকে অকাজের চিন্তায় মগ্ন ভাবনবিলাসী তুলসী কখনওই সুখে থাকে না। নিশ্চিন্ত না থাকাটা তার নিয়তির মতো যা তার চরিত্রের ব্যক্তিত্বহীনতারই পরিচায়ক। তাই ''কোনও দিন স্কুল কামাই গেলে সারাদিন তার চিন্তা হয় পরদিন হেডমাস্টার তাকে ডেকে অপমানকর কিছু বলবে কিনা। এই চিন্তা এমনই পেয়ে বসে তাকে যে, সারাটা দিন সে চাপা উত্তেজনায় কাটায়।"[২৩] এই 'পাছে লোকে কিছু বলে' বোধ একেবারেই বাঙালি মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার পরিচায়ক। মৃত্যুপথযাত্রী ললিতকে দেখাশোনার পিছনেও ছিল তার এই লোকনিন্দার ভয়, হৃদয় উৎসারিত ভালোবাসা নয়। তাই তুলসীর ভাবনায় এসে যায় ''হয়তো মাস কয়েক পর ললিতদের ঘরটা খালি হয়ে যাবে। কম ভাড়াতেই ললিতরা আছে।.... তুলসীর একবার ইচ্ছে হল শম্ভুকে জিজ্ঞেস করে, এবার তারা কত ভাড়ায় ঘরটা দেবে।"[২৪] অর্থাৎ ললিতের মৃত্যুর পর ললিতের ঘরে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করার গোপন ইচ্ছা আসলে পেশাজীবী বাঙালি মধ্যবিত্তের মুখোশের আড়ালে প্রকৃত মুখের স্বরূপকেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিবাহিত জীবনে তুলসী দুটি সমস্যার মুখোমুখি হয়। একটি হল তার স্ত্রী মৃদুলাকে প্রেমিকা হিসাবে না পেয়ে বদলা নিতে বদ্ধপরিকর বিভুকে প্রতিহত করা। কিন্তু সেরকম মানসিক দৃঢ়তা তুলসীর ছিল না। তাই দুর্বলচিত্ত তুলসীর প্রশ্ন ''কেন কিছু লোক মৃদুলার পিছনে ঘুরঘুর করত? কেন? অ্যাঁ! কী তাদের অধিকার একটা মেয়ের পিছনে ঘুরঘুর করায়। ভয়ংকর অন্যায় এটা, ভীষণ অন্যায়।''[২৫] তুলসীর অপর সমস্যা হল বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে যৌথ পরিবারের ভাঙন জনিত সমস্যা। দাদার সংসারে কোনরকমে মানিয়ে চলা তুলসী জানে এ যুগের মৃদুলারা মেনে নিতে বা মানিয়ে নিতে শেখেনি। ''বাংলাদেশে সেই পুরানো আমল আর নেই, যখন দুটো আহ্লাদি বেড়ালের মতো দাঁত নখ লুকিয়ে মা আর জেঠিমা এক পাতে গন্ধলেবুর পাতা দিয়ে মেখে পান্তাভাত খেতে বসত।''[২৬] শুধু মৃদুলাদের দোষ দিয়ে লাভ কি। তুলসীর মনেও বাসনা ছিল একখানা 'নিজের বাসার।' যে বাসায় তারা রচনা করবে স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের পরিধিতে আবদ্ধ সুখী পরিবারের বৃত্ত। বিবাহিত জীবনের সমস্যা থেকে মুক্তি ও স্বপ্নের বাসার সন্ধানে তাই তুলসী কোলকাতা ছেড়ে গ্রামে বসতি স্থাপন করেছে। তুলসীর সমস্যা থেকে পালিয়ে বাঁচার এই হীনমানসিকতা সমকালীন যুগজীবন অনুমোদিত পদক্ষেপ।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধীরে ধীরে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে কদাচার, ডিভোর্স, যৌনবিকৃতি হাজার রকমের বিবাহগত সমস্যা যাকে সংক্ষেপে সেক্স প্রব্লেমস বলা হয়, তা খুব দ্রুতহারে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কু-সাহিত্য, কু-সিনেমা, হাজার রকমের ব্যভিচার আজ সমাজের সর্ব অঙ্গে বিরাজমান। পাশ্চাত্য তথা প্রাচ্য সব জায়গাতেই আজ সেক্স-এর বিকৃতির জয়জয়কার। এটিই সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কোটি কোটি রকমের মানসিক ব্যাধি, স্বাস্থ্যহীনতা, ক্রিমিনাল অ্যাটিচিউড, ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম, খুন, রাহাজানি, মারামারি, পারস্পরিক রাজ্যের মধ্যে অসদ্ভাব, বিদ্বেষ, আন্তর্জাতিক অশান্তি, পরমাণু যুদ্ধ সব কিছুর ঠিক মূলে একটিই কারণ সেক্স। সমাজ সচেতন লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের এই যুগোচিত সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্র প্রদর্শিত পথেই।

শ্রীশ্রী ঠাকুর হচ্ছেন কারণপুরুষ। তাই তিনি যে কোন সমস্যায় মূল খুঁজে নিয়ে তার সমাধান দিতেন। সমাজে আদর্শবান, সচ্চরিত্র বলিষ্ঠ ও সুকৃতিসম্পন্ন জাতকের আবির্ভাবের জন্যে সুবিবাহ ও সুপ্রজননের উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর আর্য্য ঋষিদের জ্ঞানলব্ধ বর্ণাশ্রম নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে বর্ণাশ্রম একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। তাতে বৈধী বিবাহের ভেতর দিয়ে বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রগতিসম্পন্ন করে তোলা হয়। তিনি বলেন বিয়েটা এমন করে দিতে হবে যাতে দাম্পত্য প্রণয়ের ফলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে শরীরে, মনে ও চরিত্রে উৎকর্ষ

লাভ করে এবং সন্তানসন্ততিও উন্নততর হয়। তাঁর বাণীতে আছে, ''উন্নয়ন আর সুপ্রজনন এইতো বিয়ের মূল, /যেমন তেমন করে বিয়ে, করিস নাকো ভুল।''[২৭] ঠাকুরের এই বাণীকে স্মরণ করে সমকালীন বিপর্যস্ত সমাজকে সঠিক পথের দিশা দেবার আশায় উপন্যাসে বিমান চরিত্রের অবতারণা। উপন্যাসে বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী বিমানই সব থেকে বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় রেখেছে তার আচার আচরণে সংলাপে। তাই ললিত যখন জোড় করে আদিত্য তুলসীর রেজিস্ট্রি বিবাহ দেবার জন্য সক্রিয় হয়েছে তখন বিরোধীমনস্ক বিমানের মন্তব্য ''আমি একটি মেয়েকে ভালোবেসে তার জন্য পাগল হয়েই বিয়ে করতে ছুটব না। কারণ, যারা ও রকম বিয়ে করে তাদের সত্যিকারের বিয়ে হয় না। বিয়ের কারণ ভিন্ন।.... বিয়ে সমাজকে সন্তান দেয়। তাই আমি দেখব কীভাবে আমি সমাজকে সুসন্তান দিতে পারি। ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে সমাজ অনেক বড়। .... জন্মবিজ্ঞানের নিয়ম রয়েছে। মানুষের ভিতরেও এরকম বর্ণের তফাত আছে। কিন্তু মানুষ জন্মবিজ্ঞানের কোনও নিয়ম মানে না। যেমন খুশি বিয়ে করে— সমাজে সব একাকার করে দিতে থাকে।''[২৮] তাই শাশ্বতীর অনিচ্ছাতে আদিত্য শাশ্বতীর রেজিস্ট্রি বিবাহে সংস্কারী বিমানের সমস্ত মন তীব্র বিরোধী হয়ে ওঠে। এবং ছলনার আশ্রয় নিয়ে শাশ্বতীকে বিবাহ রেজিস্ট্রারের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে বিমান প্রতিক্রিয়া ''এই দ্বিতীয়বার আমি একটা কিছু করলাম, জানেন ? একটা ভালো কিছু। আমার ভিতরটা ফেটে যেতে চাইছে। বলে বিমান আপনমনে আনন্দে বিভোর হয়ে হাসে। ওর সমস্ত শরীর রি রি করে কাঁপতে থাকে। যেন ডাকাতদলের হাত থেকে শাশ্বতীকে উদ্ধার করে এনেছে একজন সাহসী গোয়েন্দার মতো, এরকমই হয়তো নিজেকে মনে হচ্ছিল বিমানের।''[২৯]

সত্তর দশকের উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কমিউনিস্ট ললিত যখন সমাজ বদলানোর মায়াঞ্জন চোখে লাগিয়ে স্বপ্নে বিভোর তখনও অতি বাস্তববাদী বিমানের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট ও যুক্তিসম্মত। তার মতে ''মানুষকে সমষ্টিগতভাবে দেখার মধ্যেই একটা বিরাট ভুল আছে।.... কখনও ভেবেও দেখ না সর্বস্ব যে হারায় সে কী ভীষণ ডিসকোয়ালিফায়েড। কিন্তু মানুষকে সমষ্টিগতভাবে দেখতে শিখেছ বলেই তুমি (ললিত) মনে করো সমাজের ব্যবস্থাই তার সর্বস্ব হারানোর কারণ। সমাজ পালটালেই মানুষ পালটে যাবে।''[৩০] বিমানের বিশ্বাস মানুষের আত্মিক বিকাশের উপর। মানুষ যদি মান ও হুঁশ সম্মনিত প্রকৃত মানুষ না হয়ে ওঠে তাহলে সমাজ বদলালে মুখোশেরই কেবল পরিবর্তন হবে মুখ থেকে যাবে অন্তরালে অপরিবর্তিত। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য কর্তব্যপরায়ণতার পাশাপাশি সৎ সাহসী চিত্তের যুবকদের আজকের সমাজের খুবই প্রয়োজন। নইলে দুর্বল সৎকে দিয়ে সমাজের কোনও উপকার নেই। এ সত্য বিমান তার নিজের জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুভব করেছে। তবুও কখনো কখনো লুটেরাদের বিরুদ্ধে, মহিলাদের নিয়ে

অসামাজিক কর্মে রত যুবকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে বিমান। অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদের প্রচেষ্টা তাকে মানসিক শান্তি দিয়েছে।

(গ) 'দূরবীন'

পৃথিবীর ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীতে যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিই আন্তর্জাতিক বৃহত্তর রাজনীতির পাশাখেলার ফল। আমরা জানি রাজনীতি সমাজনীতির এক বড় অঙ্গ। আমরা এও জানি যে সুস্থ সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থনীতির সুসম বণ্টনের দ্বারা। রাজনীতি তাকে পথ দেখায়। এক একটি সময়ে আমাদের সমাজ ইতিহাসের যে পালাবদল ঘটে রাজনীতি তার মূল বড় শক্তি। রাজনীতি থেকেই জন্ম নেয় সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, ধনতন্ত্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদির মত একাধিক মতাদর্শ। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দূরবীন' উপন্যাসে রাজনীতির পালাবদলের সাথে সাথে বাঙালি মধ্যেবিত্তের সমাজ জীবনের পরিবর্তনকে তিনটি পৃথক ফ্রেমে বর্ণনা করে সমাজজীবনের ক্রমবির্বতনের ছবি এঁকেছেন।

উপন্যাসে স্বাধীনতাপূর্ব বিলীয়মান সামন্ত্রতান্ত্রিক পরিবারের সদস্য হেমকান্ত। জমিদারি সুলভ দাম্ভিকতা, আধিপত্যের মানসিকতা না থাকলেও জমিদার সুলভ উদারতা, ব্যক্তিত্ববোধের আলোকে উজ্জ্বল চরিত্র হেমকান্ত। বিবাহিত জীবনে সুখী আদর্শবান হেমকান্তের জীবনে রঙ্গময়ীর সিঁধ কেটে অনুপ্রবেশের ঘটনা তার পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনযাপনের নৈতিকতাকে প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়। হেমকান্ত চৌধুরির রঙ্গময়ীকে বিবাহ করার মতো অনৈতিক কাজের নৈতিক সমর্থন পাওয়া যায় ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্রের 'নারীর পথে' গ্রন্থে। ঠাকুর মনে করেন ''পুরুষ যদি আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে, তবে বহুবিবাহ তাহার অল্পই ক্ষতি আনতে পারে''[৩১] — ঐ রকম বহুবিবাহকে ঋষিরা নিন্দনীয় বলেননি, বরং কোথাও কোথাও উদাহরণ দিয়ে সমর্থন করে গেছেন। সমাজ চায় সুসন্তান। সুপুরুষে অর্থাৎ শক্তিমান যোগ্য পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট স্ত্রীগণ প্রায়ই সুসন্তান প্রসবিনী হয়। তাই ঋষিরা অন্তত সমাজের দিকে তাকিয়ে বোধহয় একে উৎসাহ দিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের এই সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করেই লেখক হেমকান্তের দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু সংকীর্ণ মনস্ক, স্বার্থসচেতন, গণ্ডিবদ্ধ মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারে হেমকান্ত রঙ্গময়ীর নতুন দাম্পত্য সম্পর্ক গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাই নানা পারিবারিক ও সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হেমকান্ত রঙ্গময়ী শেষপর্যন্ত কাশীবাসি হবার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষদিকে যখন ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্র অবসান হয়েছে উত্থান ঘটেছে ধনতন্ত্রের তখন হেমকান্তের মতো সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলির বিপর্যয় এসেছে দুদিক থেকে। প্রথমত চরম অর্থনৈতিক সংকট পরিবারগুলিকে ভূপতিত করে দেয়। দয়া, মায়া, ভালোবাসা এইসব মানবিক গুণাবলীর কোন অভাব ছিল না হেমকান্ত চৌধুরির মতো সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের পুরানো ব্যক্তির মধ্যে। তাঁর মূল্যবোধ অসীম। তাই এস্টেটের হাল হকিকৎ বিচার করে শচীন আর কনককান্তি যখন এস্টেটের বেশ কিছু অকর্মন্য কর্মচারীকে বিদায় দেবার সিদ্ধান্তের কথা হেমকান্তকে জানায় তখন বিদায়ী ব্যক্তিদের নাম দেখে হেমকান্তর প্রতিক্রিয়া এরকম — ''এক একটা নাম, এক একটা মানুষ। এক একটা মানুষকে ঘিরে কত স্মৃতি। .... এদের কনক ঠিক চিনবে না। শচীন তো আরো নয়। এদের কাছে এস্টেট মানেই আয়পয়। কিন্তু হেমকান্ত ঠিক সেরকম শিক্ষা লাভ করেনি। তাঁর কাছে একটা এস্টেটের মানেই অনেকগুলি মানুষের ভাগ্য। অনেকগুলি মানুষের হৃদ্যতা, আত্মীয়তা, এক মস্ত যৌথ পরিবার।''[৩২] সময়ের ব্যবধান, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তন ব্যবধান রচনা করে দেয় পিতাপুত্রের দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যেও। তাই কোলকাতাবাসী পুত্র কনককান্তি হেমকান্তকে যখন জানায় ''দিনকাল বদলে যাচ্ছে, পুরনো প্রথা আঁকড়ে থাকতে গেলে চলবে কেন? আমি তো জমিদার বাড়ির ছেলে। ব্রাহ্মণ সন্তান, তবু আমি তো ব্যবসা করতে নেমেছি।''[৩৩] তখন হেমকান্তর আবেগপূর্ণ মন কনককান্তির যুক্তিবাদী মন্তব্য খণ্ডন না করলেও অন্তর থেকে সমর্থন করতে পারেন না। তাই ''হেমকান্ত ভারী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। নতুন একটা যুগের পাগলা হাওয়া এসে তাঁর ঘরের সবকিছু ওলট পালট করে দিতে চাইছে। সম্ভবত এ থেকে তাঁর নিস্তার নেই। অলস অকর্মীর যে জীবন তিনি কাটিয়েছেন তার জন্য কিছু গুণগার তো তাঁর দেওয়ারই কথা।''[৩৪]

হেমকান্তর পরিবারে দ্বিতীয় বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে পারিবারিক বৃত্তে রাজনীতির অনুপ্রেবেশ জনিত ঘটনা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে ভারতবর্ষে সামন্ততান্ত্রিক পরিবারগুলি ছিল ইংরেজ সরকারের প্রধান সহায়ক। কিন্তু হেমকান্ত চৌধুরির ও তার পরিবারের বর্ণনায় শীর্ষেন্দু এই তথ্যকে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন। হেমকান্তর বড়দাদা বড়দাকান্ত অজ্ঞাতকারণে সংসারত্যাগী এবং ছোট ভাই নলিনীকান্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ফলে হেমকান্ত ও তার পরিবার দেশ কাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। স্বদেশি খুনি শশিভূষণ চৌধুরির পরিবারে ঘটনাচক্রে আশ্রয় নিলে প্রথমে মানবিকতার খাতিরে হেমকান্ত শশিভূষণের শুশ্রূষার কোন ত্রুটি রাখেননি। যদিও উপন্যাসের প্রথমের দিকে পরাধীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে হেমকান্তর কিছুটা নিরপেক্ষ মানসিকতার প্রকাশ আমরা লক্ষ করি। পুত্র কৃষ্ণকান্তকে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ''যে অবস্থায়

ভারতবর্ষকে ইংরেজরা দখল করেছিল সেই অবস্থায় ইংরেজদের অধীনতাই ছিল আমাদের মন্দের ভাল।"[৩৫] এমনকি তাঁর বাড়িতে আশ্রিত বিপ্লবী শশিভূষণকে নিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে তাঁর অনুভূতি এরকম — "কোন রন্ধ্র পথ দিয়ে নিয়তি আসে তা মানুষের অনুমান করা অসাধ্য। তাঁর ক্ষেত্রে সেই নিয়তি এল শশিভূষণের রূপ ধরে অনুকম্পার রন্ধ্র দিয়ে। তিনি শশিভূষণকে ধরিয়ে দিতে পারতেন বটে, কিন্তু ও কথাটাই তাঁর মনে কখনো উদয় হয়নি। নিজের গাঁটের কড়ি দিয়ে তার চিকিৎসা করিয়েছিলেন। এখন তার ফলভোগ করতে হবে।"[৩৬] অর্থাৎ শশিভূষণ তাঁর কাছে নিয়তি ছাড়া কিছু নয়। তিনি শচীনকে শশিভূষণের পক্ষে উকিল নিয়োজিত করেছিলেন যতটা না শশিভূষণের কথা ভেবে তার থেকে অনেক বেশি নিজের আত্মরক্ষার তাগিদ থেকে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ রমাকান্ত রায়ের ক্রমাগত দুর্ব্যবহার হেমকান্ত চৌধুরির মনকে বিরূপ করে তোলে। শশিভূষণ মামলায় রমাকান্ত হেমকান্ত চৌধুরির সাথে সাথে তার সমস্ত পরিবারকেই বিপন্ন করে তোলে। হেমকান্তর দ্বিতীয় স্ত্রী রঙ্গময়ী সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য ও তৎজনিত হেমকান্ত ও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্তের সুতীব্র ক্ষোভ সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যবাহী এই পরিবারের বেশকিছু সদস্যকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আবর্তে নিয়ে চলে আসে।

সামন্ততান্ত্রিকতার খোলসে আবদ্ধ হেমকান্তর পরিবারের কিছু কিছু নারী চরিত্র। তাদের মধ্যে হেমকান্তের কন্যা বিশাখা অন্যতম। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো ধনতন্ত্রের অভ্যুত্থান তাকে কোনভাবে বিচলিত করে না। তাই দূরদর্শী রঙ্গময়ী ও পিতা হেমকান্ত উঠতি বৃত্তিজীবী পরিবারের সন্তান শচীনের সাথে তার বিবাহ স্থির করলে বিশাখা সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করে। সে বলে "ওদের বাড়ি ভাল নয়। কেমন সব গরিব গরিব স্বভাব।"[৩৭] তার পছন্দের পাত্র জমিদার পরিবারের সন্তান কোকাবাবুর নাতি শরৎ। বিশাখার অহমিকাবোধের চরম পরিচয় আমরা পাই যখন সে শচীন ও তার বোন সুফলা সম্পর্কে রঙ্গময়ীকে বলে "ওদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না।"[৩৮] কিন্তু কালচক্রের অনিবার্যতার কাছে নতিস্বীকার করে অবশেষে শচীনকেই বরমাল্য দেয় বিশাখা। উপন্যাসে পাশ্চাত্যের উদার খোলা হাওয়া আবার চপলা চরিত্রকে ভ্রষ্টা নারীতে পরিণত করে। সমাজ নয় পরিবার নয়, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত কামনা বাসনাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে শচীনের সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত চপলার মতো নারীরা পুরো পরিবার তথা সমাজকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সংযমহীন এ নারী সামাজিক দৃষ্টিতে উপন্যাসে খলনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ। যদিও চরিত্রের বিবর্তন ঘটিয়ে লেখক চপলাকে অসংযমী বেপোরোয়া থেকে এক সংযমী ও সহনশীলা নারীতে পরিণত করেছেন। ব্যক্তির থেকে সমাজ অনেক বড়। উপন্যাসে চপলা চরিত্রের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লেখক যেন এ সত্যেই উপনীত হয়েছেন। নারী সম্পর্কিত যে সামাজিক ভাবনার জায়গা

থেকে লেখক চপলা চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। ঠিক তার বিপরীত ভাবনার জায়গা থেকে তিনি রঙ্গময়ী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন বলে মনে হয়। রঙ্গময়ী চরিত্র পরিকল্পনার ক্ষেত্রে লেখক সমাজের থেকেও ব্যক্তি মানুষের উপর বেশি জোর দিয়েছেন। তাই বাবার প্রেমিকা জেনেও কৃষ্ণকান্ত রঙ্গময়ীকে মায়ের স্থানে বসিয়েছে। লৌকিক বিবাহের বহু পূর্বেই রঙ্গময়ী হয়ে উঠেছে হেমকান্তর পরিবারের সর্বময় কর্ত্রী। এবং হেমকান্তর পুত্রকন্যারা রঙ্গময়ীর বিরোধিতা করলে লেখক রঙ্গময়ীকে নয় হেমকান্তর পুত্রকন্যাদেরই অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

উনিশ শ সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্টের পর থেকে সারা পশ্চিমবঙ্গে এক রাজনৈতিক অবক্ষয়ের দিক স্পষ্ট হতে থাকে ক্রমশ। আর যেহেতু স্বাধীনতা পরবর্তীকালের রাজনীতির সঙ্গে দেশীয় অর্থনীতি ও সমাজনীতি গভীরভাবে জড়িত তাই সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাও জটিল হতে থাকে। এমন জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসে কৃষ্ণজীবন চৌধুরির ও তাকে ঘিরে থাকা মানুষজনদের জীবনাচারণের মধ্য দিয়ে।

বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক অবক্ষয়ের একাধিক কারণ ছিল। স্বাধীনতার আগে দেশের মানুষের ছিল আদর্শ চকিত তীব্র সংগ্রাম-ভাবনা, দেশের ঔপনিবেশিক পরিবেশের আমূল রূপান্তরের বাসনা। তাই দূরবীনের কৃষ্ণকান্ত পরাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সে তার বাল্যকাল থেকেই ‘‘স্বদেশকে টের পায়, তার মনে হয় এই ভারতবর্ষের জন্য তার কিছু করার আছে। তার গায়ে কাঁটা দেয়। ভিতরে ভিতরে এক অদ্ভুত অকারণ আনন্দ ঢেউ দিতে থাকে। সে সামান্য সংসারের বাঁধা থাকবে না। সে সামান্য মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবে না।’’[৩৯] কৃষ্ণকান্ত বড় হয়েছে এক উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়ে। চারদিকে তখন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। দেশমাতাকে শৃঙ্খলামুক্ত করার জন্য তখন হাজার হাজার তরুণ নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, অত্যাচারী ইংরেজদের গুপ্তহত্যা, ষড়যন্ত্র, বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশি জিনিসের ব্যবহারের অঙ্গীকারে তখন বাংলার রাজনৈতিক জগৎ মুখরিত। এই যখন পরিস্থিতি তখন দেশকালের প্রতিভূ হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্য শশিভূষণ আশ্রয় লাভ করে হেমকান্ত চৌধুরির বাড়িতে। স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে প্রাথমিক পাঠ কৃষ্ণকান্ত লাভ করেছিল রঙ্গময়ীর কাছে। কিন্তু তাদের বাড়িতে শশিভূষণের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি, শশিভূষণকে কেন্দ্র করে পুলিশের দুর্ব্যবহার কৃষ্ণকান্তকে সশস্ত্র বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে বাধ্য করে। কৃষ্ণকান্তের শিক্ষক প্রতুল যে নিজে একটি সশস্ত্র বিপ্লবীদলের সদস্য সেই কৃষ্ণকান্তকে পথ দেখায়। পথ দেখায় পিতা হেমকান্ত চৌধুরির বিপ্লবীদের প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থনের মানসিকতা।

স্বাধীনতার পরে এইসব সংগ্রামের, আদর্শবাদী চিন্তা ভাবনার নায়করা রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে নিয়ে নিজেরা বদলাতে থাকে। এমন পরিবর্তন স্বাভাবিক। কারণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যেমন ক্ষমতাকে আকুলভাবে দম্ভের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে। ক্ষমতাও তেমনি অক্টোপাশের মত আষ্টেপৃষ্ঠে সেই ব্যক্তিকে জড়িয়ে নেয় নিজের দিকে। ইতিহাস ও সমাজের বিবর্তনের ধারায় এই সত্য এক অনড় স্বতঃসিদ্ধের মতো। এর ফলে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে দেখা দেয় 'রাজনৈতিক অবক্ষয়'। ক্ষমতার দম্ভ সচেতন, সংবেদনশীল, বিবেকবান, কর্তব্যনিষ্ঠ, বিচক্ষণ, আদর্শবাদী ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমশ ওইসব গুণাবলীকে অপসারিত করে দেয়। সাধারণ মানুষ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে করে তারা ছাড়া সাধারণ মানুষের তথা দেশের উন্নতি নেই। সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়েই আইন করে শুধুমাত্র পরিকল্পনা করে তারা দেশের রূপান্তর ঘটাতে পারে— এই তাদের বিশ্বাস হয়ে ওঠে। এমন চিন্তাধারাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে উপন্যাসে বর্ণিত রাজ্য রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণকান্ত চৌধুরির মধ্যেও।

বাঙালি মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এর কারণ নিহিত ছিল ব্রিটিশ সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতির মধ্যে। এই নীতির একটি বড়ো ফল হল ভূমির উপর নির্ভরশীল নানা স্তরের এবং ছোট বড় মাঝারি নানান্ মাপের মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি। দিনে দিনে ভূমি যতই বিভক্ত হয়ে স্বল্পায়তন হতে লাগল এবং অন্যদিকে নগরের বৃত্তি ও চাকুরির মাধ্যাকর্ষণ যতই বাড়তে লাগল, ততই হেমকান্ত চৌধুরির পরিবারের মতো অস্তমিত জমিদার পরিবারের সদস্যরা শহরবাসী হতে লাগল। এঁদের মানসিকতার মধ্যে কিছু পরিমাণে পরশ্রমভোগীর মানসিকতার প্রভাব টিকে রইল, প্রাচীন ধ্যানধারণার জেরও কিছু কিছু বজায় থেকে গেল। 'পিউরিটান' কৃষ্ণকান্তের রেমির অসুস্থতার সময় রক্তের বিশুদ্ধতার বাছবিচার তার প্রাচীনপন্থী মানসিকতারই প্রকাশক।

পূর্বের যুগে ''বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ গঠনের দুটি প্রধান সূত্র ছিল হিন্দুর বর্ণভেদ প্রথা ও একান্নবর্তী পরিবার। এই দুয়ের মধ্যে বর্ণভেদ-প্রথার যত দোষই থাক এই প্রথা যে হিন্দুর সমাজজীবনে একটা সুদৃঢ় বন্ধন রূপে দীর্ঘকাল কাজ করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বর্ণভেদ-প্রথা হিন্দু সমাজে আভ্যন্তরীণ বিভেদ যেমন সৃষ্টি করেছে, তেমনি এই প্রথা বাহ্য সংমিশ্রণ থেকে হিন্দু সমাজকে প্রাচীরের মতো রক্ষা করে এসেছে। মধ্যযুগে ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য যখন হারিয়ে গেল তখন হিন্দুসমাজের বাহ্য বন্ধন ছিল এই জাতিভেদ প্রথাকে আশ্রয় করেই। আধুনিকযুগে এই জাতিভেদে যখন ভাঙন ধরল তখন তার চারদিকের প্রতিরক্ষার প্রাচীরটিও ধসে পড়ল। জাতীয় চেতনায় ব্যপ্তি এল, তেমনি পুরাতন বন্ধন শিথিল হওয়ায় বহিরাগত জলস্রোতের প্রথম ধাক্কায়

সমাজজীবন ভেসে গেল। জাতিভেদ প্রথাকে আশ্রয় করে হিন্দুর যে সমস্ত জরাজীর্ণ অন্তঃসারশূন্য মূল্যবোধ ঝুলছিল, সে সবই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।"[৪০] মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে তীব্র এই ভাঙনের মুখে কৃষ্ণকান্ত চৌধুরির জাতপাতে বিচার, রক্তের বিশুদ্ধতায় বিশ্বাস আমাদের পুরানো সমাজব্যবস্থার গঠনমূলক দিকের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কৃষ্ণকান্ত জানে তার অসুস্থ পুত্রবধূ রেমির জন্য ''নার্সিং হোমে রক্তের অভাব নেই, টাকা ফেললেই বোতল বোতল রক্ত পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণকান্তের সেইসব অজ্ঞাত কুলশীল রক্তে আস্থা নেই। সেইজন্য পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন সবাইকে খবর দিয়ে রেখেছেন, বউমার অপারেশন, রক্ত দরকার তোমরা এসো।"[৪১] তিনি ডঃ মিত্রকে আবার এও জানিয়েছেন ''তোমরা সব আপ টু ডেট লোক, ব্লাডের ব্যাপার বোঝ না। আমার একটু সংস্কার আছে। আই ওয়ান্ট ব্লাড অফ মাই ওন ক্ল্যান। এটা সায়েন্টিফিক ব্যাপার কিছু নয়। আমার একটু সংস্কার আছে।"[৪২] আবার রঙ্গময়ীর নাতনী নোটনের সাথে পুত্র ধ্রুবর বিবাহের প্রস্তাব নাকচ করার পিছনে রঙ্গময়ীর পরিবারের ব্রাহ্মণত্ব ছিল অন্যতম কারণ। দূরদর্শী ব্যক্তি কৃষ্ণকান্ত জানতেন প্রতিলোম বিবাহ কেবল নরনারীর দাম্পত্য জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না প্রতিলোমজ বিবাহ কু-সন্তানের জন্ম দিয়ে সমাজব্যবস্থাকেই বিপন্ন করে তুলতে পারে। আর সন্তান উৎপাদনই যেহেতু বিবাহের মূল কারণ তাই প্রতিলোমজ বিবাহ তার দৃষ্টিতে কখনোই সর্মথনযোগ্য নয়।

দেশবিভাগের কারণে ছিন্নমূল পরিবারের সকল সদস্যদের প্রতি এক গভীর সামাজিক কর্তব্যপরায়ণতা ছিল কৃষ্ণকান্তের মধ্যে। পরিবর্তে শ্রদ্ধা ও আধিপত্য ছিল তার কাম্য। সম্পত্তি নিয়ে আপাত বিরোধ থাকলেও তার পরিবারের কনিষ্ঠ থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলের মনেই ছিল কৃষ্ণকান্তের প্রতি একটা ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা। কোন কোন সদস্যের মনে কৃষ্ণকান্তের প্রতি গভীর আন্তরিকতাও ছিল। যেমন লালটু। তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ''ছোটকাকার সঙ্গে তার একটা কাজিয়া চলছে বটে, কিন্তু কাকা কাকাই। রক্তের গভীর সম্পর্ক।"[৪৩] এই রক্তের সম্পর্কের গভীরতা বোধের অভাবই আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা। কৃষ্ণকান্তের মতো সমাজ সচেতন, সময় সচেতন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কিন্তু পারিবারিক জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ, শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। বাল্যকাল থেকে রাজনীতির কারণে গৃহত্যাগী কৃষ্ণকান্ত চৌধুরির সাংসারিক অভিজ্ঞতার অভাব, স্ত্রী চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা, সর্বপরি সংসারের ক্ষুদ্র সীমাতে আবদ্ধ না থেকে দেশ তথা রাজনীতির বৃহৎ ক্ষেত্রে বিচরণ করার অভীপ্সা তার জীবনে বিপন্নতাকে সিঁধ কেটে প্রবেশ করার রাস্তা করে দেয়। স্বাধীনতাত্তোর ভারতবর্ষের অসামান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণকান্ত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় এক এক অতিসাধারণ স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্না সংসারের চাওয়া পাওয়ার সীমায় বদ্ধ নারীর সাথে। সংসারের প্রতি স্ত্রীর প্রতি কৃষ্ণকান্তের অমনোযোগ, গুরুত্বহীন মানসিকতা এই নারীর মনে হীনমন্যতার জন্ম

দেয় যার পরিণতিতে সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। স্ত্রীর আত্মহত্যার সাথে সাথে কৃষ্ণকান্ত হারায় তার প্রিয় পুত্র ধ্রুবকেও। কারণ কৃষ্ণকান্তের নিজের কথায় "হি ওয়াজ এ উইটনেস অফ দি ইভেন্ট। ছেলে নিজের চোখের সামনে যদি নিজের মাকে পুড়ে যেতে দেখে তবে তার একটা পার্মানেন্ট এফেক্ট তার মনে থাকবেই।"[৪৪] ধ্রুবর ক্ষেত্রে এই পার্মানেন্ট এফেক্টটা হয়েছিল খুব সংঘাতিক।

ধ্রুব গোটা উপন্যাসে প্রতিবাদের মূর্ত বিগ্রহ। তবে রেমির প্রতি তার আচরণ প্রথম থেকেই অকারণ উপেক্ষা-প্রসূত। ধ্রুবর বিপথ-গমন একেবারে মাত্রাতিরিক্ত বিপজ্জনক। একটা মস্তানরাজ গড়ে উঠেছে ধ্রুব-র চারদিকে। প্রচলিত সমাজজীবনের শান্তিকে বিঘ্নিত করাই হল ধ্রুব ও তার সহযোগীদের একমাত্র লক্ষ। ধ্রুবর স্ত্রী-র প্রতি দুর্ব্যবহার, পিতা সম্পর্কে কটুক্তি, সন্তানের জন্মকে অভিনন্দন জানানোর জন্য পিতা হিসাবে স্বাভাবিক আগ্রহের অভাব ধ্রুবকে শুধু প্রতিষ্ঠান বিরোধী করে তোলেনি, কিছুটা অস্পষ্টও করে রেখেছে। তার বেপোরোয়া মনোভাব যেন সব কিছু ভেঙেচুরে তছনছ করার আগ্রহে উদ্দাম। প্রচলিত রীতিনীতিতে আস্থাহীনতা ছিল ধ্রুবর। ছেলের সঙ্গে দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও কৃষ্ণকান্ত ছেলের যথেচ্ছাচারকে রাজনৈতিক Protection দিয়েছেন আর পিতার এই কাজ পুত্রের কাছে একধরনের ভ্রষ্টাচার মনে হয়েছে। ধ্রুব কী চেয়েছিল তা অনুচ্চারিত, তবে তার গোপন মনে authentic exirtence সম্পর্কে নিগূঢ় বাসনা ছিল বলেই কৃষ্ণকান্ত সম্পর্কে ছিল বদ্ধমূল বিরাগ। রাজনীতির নেতারা কষ্টসহিষ্ণু হয় না, সত্যাশ্রয়ী হয় না, রাজনীতির মধ্যে কষ্ট জড়িয়ে থাকে — এই ধারণাই ধ্রুবকে নিজবাসভূমে পরবাসী করে রেখেছিল। কিন্তু ধ্রুব পিতা কৃষ্ণকান্ত সম্বন্ধে গোপন মনে দুর্বলতা পোষণ করত। তার ইঙ্গিত আমরা উপন্যাসে যেমন পাই তেমনি কৃষ্ণকান্ত গভীর বেদনাকে একান্ত সম্বল করে আত্মঘাতী হওয়ার আগে ধ্রুবকে লেখা চিঠিতে নিজেকে ক্লান্তচিত্তে সমর্পণ করেছেন। কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হয়ত ধ্রুবকে ফিরিয়ে আনবে সুস্থ সমাজজীবনের ভারকেন্দ্রে। তার আগে শুধু বুকের ভিতরটা মথিত হয়ে একটা ডাক উঠে আসতে চাইছিল 'বাবা'।

উপন্যাসে বিস্ময়কর দুই নারী চরিত্র রঙ্গময়ী ও রেমি। তিন পুরুষ-এর এই গল্পে হেমকান্তর জীবনে প্রচলিত ছক ভাঙার অন্য একটা ছক ছিল রঙ্গময়ীকে কেন্দ্র করে। কৃষ্ণকান্তর জীবনে এই নারী হয়ে উঠেছিল সব কিছু সন্তানদেরও মাতা, যদিও গর্ভধারিণী নয়। কিন্তু অপার মমতায় হেমকান্তর পরিবারকে আলিঙ্গন করে রেখেছিল নিন্দা প্রশংসা উপেক্ষা করে। অন্যদিকে আশ্চর্য রেমি! ধ্রুবকে তার স্বভাব ও সংস্কার দিয়ে গ্রহণ করেছিল সে। রেমি-র মধ্যে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যে অনড় আসক্তি। রাজা-কে সে বলেছিল 'স্বামীর শতেক দোষ থাক, বিবাহ মানে তো বহন। ঠিক সওয়া যায়, বয়ে

নেওয়া যায়। রাজা বুঝেছিল এবং রেমি-কে বলেছিল ''এক কোটি বছর তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেও বোধহয় কেউ তোমার মন পাবে না ..... তুমি রিমোট কনট্রোলড এক রোবট মাত্র। তোমার নিজস্ব সত্তা নেই।''[৪৫] রেমি-র পতিব্রত্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু বিস্ময়কর ভালোবাসা হেমকান্ত সম্পর্কে রঙ্গময়ী বা মনু-র এবং পিতার প্রেমিকা রঙ্গময়ী-র প্রতি কৃষ্ণকান্তর শ্রদ্ধা। আসলে নোটন বা ধারার মতো স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারী, সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক নারী নয় আশাবাদী লেখক শীর্ষেন্দুর কাম্য চিরন্তন সেই ভারতীয় নারী। যে তার সহনশীলতা, পতিব্রতা ও সেবাপরায়ণতা দিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করবে। তাই কখনো কখনো লেখক সৃষ্ট নারীচরিত্রগুলি আদর্শের ভারে কিছুটা কৃত্রিমতা ও যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট হয়েছে।

(ঘ) 'মানব জমিন'

অতীতকাল থেকেই মধ্যবিত্ত বাঙালির সমাজজীবনে পরিবার গঠনে পুরুষরা জুগিয়েছে শক্তি, নারীরা জুগিয়েছে মাধুর্য। কিন্তু আধুনিক যুগের শিল্পায়ন, যন্ত্রীকরণ, বণিকবৃত্তির প্রসার ও অসম বণ্টন প্রভৃতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তর একদিকে যেমন আমাদের অন্তরের শুষ্কতা ও দৈন্য, চিত্তের সঙ্কীর্ণতা ও আত্মার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে। অপরদিকে আমাদের লোভ লালসাকে জাগ্রত করে তীব্র এক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে এনে ফেলেছে। এ যুগে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার চাপে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মেয়েরা চাকরির জন্যে বেরিয়ে আসায় বাঙালির দীর্ঘকালের লালিত গৃহগত মাধুর্যটুকু নষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে এতে নারীর অর্থনৈতিক স্বালম্বন যেমন এসেছে তেমনি সমাজে নারীর স্বাধীন মেলামেশার সুযোগ ও প্রয়োজন বেড়েছে। ফলে তার জীবনে দেখা দিয়েছে নতুন নতুন সমস্যা। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অঙ্গনে নবরূপে সজ্জিতা এইসব নারীদের কাছে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের পবিত্রতা ও সনাতনত্ব কখনো কখনো অর্থহীন প্রতিভাত হচ্ছে। ফলে ব্যক্তির মূল্যবোধ ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এবং ব্যক্তির চিত্তে নানা বৃত্তির জটিলতা ও ঘাতপ্রতিঘাত দেখা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত নারীর স্বাধিকার প্রমত্ততা এবং সেই কারণে মধ্যবিত্ত পুরুষের হীনমন্যতা ও সামাজিক বিপর্যয়ের আলেখ্য বর্ণিত হয়েছে 'মানব জমিন' উপন্যাসে।

উপন্যাসে পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের নারী তৃষা শুধু চায় একটা ছোটখাটো রাজত্বের ওপর নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব করতে। প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার গোপন অভীপ্সা থেকেই বিংশ শতাব্দীর চরম ভোগবাদের স্বীকার তৃষা সবরকম সংস্কারমুক্ত হয়ে তার সেবা প্রেম, ভালোবাসা দিয়ে বশীভূত করেছে স্বামী শ্রীনাথের অবিবাহিত দাদা মল্লিনাথকে। মল্লিনাথের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তৃষার কাছে ''সতীত্ব বা এককেন্দ্রীক জীবন কতনা অর্থহীন। কতই না হাস্যকর

শব্দ ভালোবাসা। রাজার আমলের টাকার মতোই তা অচল। মল্লিনাথের সংস্পর্শে এসে সে যখন দারিদ্র্যমোচনের পথ দেখলো তখন কোন মানসিক বাধাই তাকে আটকে রাখেনি। লোকে বলে অবৈধ সম্পর্ক। কিন্তু তাই কি? তৃষা কোন পুরুষকেই ভালোবাসে না বটে কিন্তু তবু তার যেটুকু স্নেহ এখনও বুকের তলানিতে পড়ে আছে তার যোগ্যপুরুষ সারাজীবনে ওই একজনকেই পেয়েছিল তৃষা। সে মল্লিনাথ, ওই একজনকেই তার পরপুরুষ বলে মনে হয়নি কোনও দিন। বরং ওই একজনের প্রতি মানসিক বিশ্বস্ততাই তাকে খানিকটা সতীত্ব বা ওই ধরনের কিছু দিয়েছে।"[৪৬] বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীর সতীত্বের এই অভিনব ধারণা প্রচলিত সমাজ সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত হানে। শুধু তাই নয় মল্লিনাথের দান করা পাঠশালার জমি উদ্ধারের কাজে প্রধান বাধা রাজনৈতিক কর্মী শুভঙ্করকে কব্জা করতে তৃষা তার সুন্দরী আধুনিকা এলাহাবাদবাসী মেয়ে চিত্রলেখাকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করার আগে একবারও ভেবে দেখেনি বরং তার উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় সে খুশিই হয়েছে। এইভাবে সম্পত্তির মালিকানার লোভে নারীর নিজেকে পণ্য করে তোলার মানসিকতা বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়কেই চিহ্নিত করে।

আবার নারীত্ব সতীত্ব এ সবকিছু বিসর্জনের বিনিময়ে অর্জিত সম্পত্তি রক্ষার্থে অসতী নারী তৃষা সন্দেহপ্রবণ ও কুচক্রী হয়ে উঠেছে। সাংসারিক দায়িত্ব পালন ও বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে কঠোর তৃষার যান্ত্রিকতার কাছে সরে গেছে তার পুত্রকন্যা ও আপনজনেরা। নষ্ট হয়ে গেছে পরিবারের আপনজনদের মধ্যে আন্তরিকতার সম্পর্ক। তৃষার পুত্র সজল মায়ের শত্রুপক্ষ হিসাবে নিজেকে গোপনে তৈরি করেছে। প্রবল বিচক্ষণশীল মহিলা তৃষা এ সত্য জানার পর বাঙালি নারীসুলভ আবেগপ্রবণতা নয় বরং তার মনে হয়েছে ''এখন আরও বুদ্ধিমান, আরও হিংস্র, আরও তৎপর মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে হবে তাকে। যাদের ওপর কিছুতেই আধিপত্য বিস্তার করা যাবে না।"[৪৭] কিন্তু নারীশক্তির এই দাম্ভিক বহিঃপ্রকাশ বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ অনুমোদিত নয়। তাই অজস্র বিত্ত ও ক্ষমতার অধিকারিণী হয়েও উপেক্ষিত স্বামী শ্রীনাথের কাছেই দুঃখ করে তৃষা বলেছিল। ''আমি সংসারে সবকিছু ঘেঁটে দেখেছি। আমি জানি ও থেকে আমার কিছু পাওয়ার নেই। একজনেরও মন পাইনি, কেউ আমার জন্য একটু দুঃখ করে না, আমাকে নিয়ে ভাবে না।"[৪৮] তৃষা চরিত্রের চারিত্রিক দৃঢ়তার পতনের সংবাদ আমরা তৃষার এইসব সংলাপ থেকে পরিষ্কার বুঝে নিতে পারি। এ পতন যেন শুধু পারিবারিক বৃত্তে তৃষার পতনের কথাই বলে না এ যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর আত্মসমর্পণকেই ইঙ্গিত করে। তাতে যেন নারীর নিজেরও পরম তৃপ্তি। তাই দীপনাথকে ওপরওলা মেনে নিজেকে ধীরে ধীরে তার কাছে উন্মোচন করে বিংশ শতাব্দীর নারী তৃষা কিছুটা মানসিক আশ্রয়ও লাভ করেছে।

আধুনিক জীবনে অতিনাগরিক বৈদগ্ধের ফলে আমাদের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে নারীদের জীবন থেকেও সারল্য ও আন্তরিকতা বিদায় গ্রহণ করেছে। তাদের কথা ও কাজের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট ব্যবধান। তাদের শিক্ষায় দীক্ষায় সামাজিক আচার-আচরণে, এমনকি তাদের প্রেম ভালোবাসায় যে মিথ্যাচার আত্মগোপন করে আছে তার আবরণ উন্মোচিত হয়েছে উপন্যাসে বিলু চরিত্রের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপাদমস্তক দ্বিচারিণী এই নারীর প্রেমিক অরুণ সম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ''ওর সঙ্গে আমার ভাব ছিল। খুব ভাব, হয়তো বিয়েও করতুম.... ও ভীষণ মেয়েদের সঙ্গে মিশত। বাছবিচার ছিল না, ওরকম পুরুষ একটু আনফেথফুল হয়। .... তার ওপর অরুণ আবার ভীষণ ফ্রি।''[৪৯] স্বামী প্রীতমের কাছে বিলুর এই অকপট, নির্লজ্জ মন্তব্য নারী হিসাবে বিলু চরিত্রের নৈতিক স্খলনকেই সূচিত করে।

অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এই নারীর মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক আবেগহীন যান্ত্রিকতার। তাই অসুস্থ স্বামী প্রীতম তার কাছে একজন মানুষ ছাড়া বিশেষ কেউ নয়। তাই প্রীতমের জন্য তারকেশ্বরে মানত করতে যাওয়ার প্রসঙ্গ ''সে অরুণকে নীরস গলায় বলল যদি বুঝি তাতে কাজ হবে তাহলে তাও করব। একজন মানুষের জন্যই করবো তো।''[৫০] এহেন বিলু মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর অনিশ্চিত জীবনজীবিকার উপর নির্ভর না করে নিজেই পয়সা উপার্জনের রাস্তা খুঁজে নেবে এটাই স্বাভাবিক। তাই ''একটা শ্বাস ফেলে বিলু বলল, প্রীতম তো বাঁচবে না, সেজদা তারপর আমার আর লাবুর কী হবে? কে দেখবে আমাদের?''[৫১] অরুণের বাবার আনুকূল্যে বিলু যখন বাইরে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে এসেছে, এসেছে তার অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন। ফলশ্রুতিতে বিলু, প্রীতম, লাবুকে ঘিরে গড়ে ওঠা পরিবারের সুস্থ সম্পর্ক বিকৃত ও নষ্ট হয়েছে। ধীরে ধীরে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হওয়ায় বিলুর স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ আরও বেড়ে গেছে। তার আবেগহীন ভালোবাসার শিকার প্রীতম-বিলুর কন্যা লাবুও। মাতৃস্নেহহীন শিশু লাবুর ক্রমবিকাশ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়েছে। যে সমাজে শিশুর ভবিষ্যৎ অসুরক্ষিত সে সমাজ যে দ্রুত বিকৃতির দিকে ধাবমান এ সত্য সমাজবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাই বিলুর মতো নারীরা পরোক্ষভাবে ভবিষ্যৎ সামাজিক বিকৃতির অন্যতম কারণ।

প্রত্যেক পরিবর্তন বা বিপ্লব কাঙ্ক্ষিত ফলের পাশাপাশি কিছু অবাঞ্ছিত অনভিপ্রেত ফলকে অসচেতনভাবে বহন করে আনে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালি সমাজে যে নারী জাগরণের সূচনা বিংশ শতাব্দীর নানা আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যা চরম রূপ পায় এবং যার প্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে, নারীদের জীবনযাপনের ধরন প্লাটে যায় মণিদীপার মতো নারী সেই পরিবর্তনেরই অবাঞ্ছিত ফল। বিংশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজজীবনে পরিবর্তন ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগকে

কাজে লাগিয়ে এই নারী হয়ে উঠেছে স্বেচ্ছাচারী ও বিপথগামী।

জীবনবোধের গভীরতাহীন এই নারী সত্তরের দশকে উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আকৃষ্ট হয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সমন্বিত পরিবার থেকে উঠে এলেও রাজনীতি ছিল তার কাছে রোমান্টিক বিলাসের নামান্তর। তাই অত্যন্ত নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ওঠে আসা এবং কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট মণিদীপা বিবাহসূত্রে এলিট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হলে তাকে এক পোশাকে কখনও দু'দিন দেখেনি দীপনাথ। স্বামী মিঃ বোসের উপর অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়েও মিঃ বোস সম্পর্কে তার মন্তব্য ''আমি কোনও বড় লোককেই সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে ওর মতো হামবাগ স্লেভ এগজিকিউটিভদের। আমি ওকে জাংকারপট করে ছাড়ব।''[৫২] আবার দেশের বহু মানুষ যখন বুভুক্ষ তখন একজন বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তার মন্তব্য ''ওই যে খাওয়ার কথা, খাওয়াটা এমন বড় প্রবলেম কি?''[৫৩] এ মন্তব্য একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তার রাজনৈতিক মতাদর্শের পথপ্রদর্শক স্নিগ্ধদেব চ্যাটার্জির জীবনাচারণ, মিথ্যাচারিতা একেবারেই বামপন্থি মতাদর্শের চরম পরিপন্থী। আসলে বামপন্থার খোলসধারী স্নিগ্ধদেবের অন্তরালে যে প্রকৃত মানুষটি আত্মগোপন করেছিল স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন নারী মণিদীপা কোনদিন তার সন্ধান করেনি। ফলে তার অবিমৃষ্যকারীতায় সে নিজে যেমন বিপর্যস্ত হয়েছে বিপর্যস্ত করে তুলেছে স্বামী মিঃ বোসকেও। আসলে বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে বামপন্থী দলে ভাঙনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বহু ছদ্মবেশধারী ভুঁইফোড় কমিউনিস্ট নেতার আবির্ভাব ঘটে যারা আন্দোলনের অন্তিমযাত্রাকে সুনিশ্চিত করে। স্নিগ্ধদেব, মণিদীপার মতো কমিউনিস্টদের অকমিউনিস্টচিত আচরণে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের চরম পরিণতিকেই সুনিশ্চিত করে।

''সব মানুষই এক অসমাপ্ত কাহিনি। কোনো মানুষই তার জীবনের সব ঘটনা, সব কাজ শেষ করে যায় তো। ..... দীপনাথ টের পায়, স্বদেশ নয়, শেষ পর্যন্ত এক মহা পবর্তই কোল পেতে বসে থাকবে তার জন্য। যেদিন তার কোলে যাবে দীপনাথ সেই দিন পরম পিতা সেই পাহাড় তুষারস্তূপের পড়তে পড়তে দীপনাথকে মিশিয়ে দেবে। আদরে সোহাগে। দুঃখ দৈন্য, দুর্দশা, অপমান স্মৃতিভার থেকে শীতল মুক্তি।''[৫৪] 'মানব জমিন' এর সাড়ে পাঁচশোর চেয়ে বেশি পৃষ্ঠার পথ পরিক্রমার শেষে এই সিদ্ধান্ত প্রশান্ত, গুরুতর দার্শনিক ভাবনা প্রসূত নয়। '' 'শীতল মুক্তি' কথাটার সঙ্গে ভালো লাগা, ভালোবাসা, শান্তি-নিবিড়-সংসক্ত। কিন্তু শেষের এই উচ্চারণ অনেক বহ্নিগর্ভ ঘটনা সংঘাতের পরে এসেছে, যেন হোমাগ্নি শিখায় শেষ আহুতি দানের পর ঋত্বিকের উচ্চারণের মতো। সর্বক্ষণ দাহ, যাতনা সহ্য করে, বঙ্কিম গতিপথ পরিক্রমার পর এ যেন মহাভারতের শান্তিপর্ব-এর একটি আধুনিক রূপান্তর। কুরুক্ষেত্রের আত্মীয়বিরোধ ও সংঘর্ষ একালের আত্মদ্বন্দ্ব ও নিভৃত

রক্তক্ষরণে পরিণতি পেয়েছে। প্রত্যহের ঘটনাই তো সমরের নিত্য রসদ। একালের মানুষ রাজ্যলোভে স্বজন হত্যা করে না ; একালের মানুষের রক্তের মধ্যে যেন Cannibalism নিত্যবহমান। তাই কখনো নিজেই নিজেকে চেনে না, নিজের স্ত্রী-পুত্র সম্পর্কে বিমুখতা ও ঔদাসীন্য দেখাতে দেখাতে একসময় নিজেকে ভাঙতে উদ্যত হয়।"[৫৫] 'মানব জমিন'-এর শ্রীনাথের বিদ্রোহ ছিল প্রথমত তার সেই স্ত্রীর বিরুদ্ধে যার সন্তান সজল চরিত্রে চেহারায় আদলে প্রতি মুহূর্তে জানিয়ে দেয় সে তার জ্যাঠামশাই মল্লিনাথের সন্তান। শ্রীনাথ নিজেকে ভাঙে, স্ত্রী তৃষার আপন ব্যক্তিত্বে গড়ে তোলা ভাবমূর্তির ওপর আঘাত হানে। দূরবীন-এর ধ্রুব-র মতো শ্রীনাথও প্রতিষ্ঠান বিরোধী। তবে ধ্রুব-র যন্ত্রণায় একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য ছিল। কিন্তু শ্রীনাথের অত্যধিক মদ্যপান, পতিতালয়ে যাওয়া, বাড়ির অপরাংশে স্ত্রী সম্পর্ক রহিত হয়ে বসবাস করা, বৃদ্ধ পিতার প্রতি উপেক্ষা, সজলের মধ্যে নিজেকে খুঁজে না পেয়ে তাকেই তৃষা-র বিরুদ্ধে ব্যবহারের চেষ্টা, রাস্তার লোকের সঙ্গে মর্যাদা হারিয়ে কদর্য লড়াই করা— প্রতি মুহূর্তে যেন একটা শ্রীনাথের জায়গায় অনিবার্য করে অন্য শ্রীনাথের জন্ম হয়েছে। একমাত্র পুত্র সজল ক্রমে বড়ো হয়ে ওঠে। নিজের রহস্যময় জন্ম নিয়ে প্রশ্ন করে, মল্লিনাথের ছদ্মবেশে আলো-আঁধারিতে ভয় দেখায়। অদ্ভুত মানবচরিত্র। সজলের যেমন ক্রমে টান বাড়ে বাবা শ্রীনাথের প্রতি, শ্রীনাথ তেমনি সজলের মধ্যে তার নিজের জয়পরাজয়ের অন্যরকম হিসাবে দ্যাখে।

বিচিত্র শস্যের ভারে পীড়িত 'মানব জমিন' পরম রহস্যময়। তাই মণিদীপার প্রতি সসম্ভ্রম দূরত্ব রেখে চলেছে যে দীপনাথ, একদিন সে-ই সুখেন্দুর সঙ্গে এসে সুখেন্দু'র প্রেমিকা এবং পরস্ত্রী বীথির সঙ্গে রাত কাটিয়ে যায়। সুখেনের জীবনে সেই অর্থে আশাভরসা নেই, তবু বীথি-র দিকে দীপনাথকে ঠেলে দিয়ে মানব-অস্তিত্বের গোড়া ঘেঁষেই একটি অনুচ্চারিত প্রশ্ন তুলে ধরে ''তবু কাউকে একটু ওপরের মানুষ ভাবতে ভাল লাগে তো।"[৫৬] সুখেনের আরও মন্তব্য ''পৃথিবীর সবাই আমার মতো দোষে গুণে মানুষ এটা যদি সত্যিও হয়ে তাহলেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না"[৫৭] — এইসব উচ্চারণেই রয়েছে অনুচ্চারিত কিছু জিজ্ঞাসা। অতি সাধারণ সুখেন মদ্যপ হয়েও অস্তিত্বের সারকথাই তুলে ধরেছে দীপনাথের কাছে।

উপন্যাসে তৃষা-শ্রীনাথ, মল্লিনাথ-সজল একটা জটিল আবর্ত, দীপনাথ-মণিদীপা-বোস সাহেব, সুখেন-বীথি আর একটা আবর্ত এবং তৃতীয় আবর্ত এবং হয়ত বা সেটাই জটিলতম রচনা করছে বিলু-প্রীতম-অরুণ-লাবু প্রমুখ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সুচাকুরে যুবক প্রীতম প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল। উত্তরবঙ্গে প্রকৃতির সবুজ লালিমায় পাহাড়ের স্নিগ্ধ কোলে বেড়ে ওঠা প্রীতম কোলকাতার নগরজীবনের মেকীত্বের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। উত্তরবঙ্গে ফেলে আসা তার বিশাল একান্নবর্তী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন প্রীতম স্ত্রী বিলু ও

কন্যা লাবুকে অবলম্বন করে সুখী মধ্যবিত্তের জীবনযাপনের আশাতে বাধ সাধে তার অজানা অসুখ। মৃত্যুপথযাত্রী প্রীতমের কাছে ধীরে ধীরে সংসারের অসাড়তা ধরা পড়ে। বাঙালি মধ্যবিত্ত নারী বিলুর মুখোশের অন্তরালে মুখের স্বরূপ দেখে প্রীতম হতাশাগ্রস্ত, ব্যথিত হয়। চরম স্বার্থপরতা বিলু চরিত্রকে এতটাই নীচে নামিয়ে যে তার মধ্যে নারীত্বেরও চরম অবমাননা ঘটেছে। নরনারীর বিবাহ ব্যাপারটা নাকি স্বর্গ-নির্দিষ্ট অর্থাৎ কোন পুরুষের সঙ্গে কোন নারীর বিবাহ হবে সেটা পূর্ব নির্দিষ্ট এবং একবার বিবাহ হলে পর আমৃত্য সে সম্পর্কটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এটা প্রাচীন মূল্যবোধ। আধুনিককালে বিবাহবিচ্ছেদ আইনসম্মত এবং এই আইনের সাহায্য নিতে পুরুষের মতো নারীরাও অনাগ্রহী নন। বিবাহবিচ্ছিন্ন নরনারীর পুনর্বিবাহও আজ অসামাজিক বা বেআইনি নয়। স্বর্গ-নির্দিষ্ট ব্যাপারটা আজ নেহাতই সামাজিক চুক্তির রূপ গ্রহণ করেছে। উপন্যাসে আধুনিকা, শিক্ষিতা নারী বিলু আইনি সাহায্য নিয়ে অসুস্থ স্বামী প্রীতমের সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের পথে না গিয়ে একই সাথে স্বামী প্রীতম ও প্রেমিক অরুণের সাথে যেভাবে সম্পর্ক বজায় রেখেছে তা বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চরম নিদর্শন। নিঃসন্তান দম্পতির পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ যত সহজ, সন্তানসহ দম্পতির পক্ষে বিবাহবিচ্ছেদ ততটাই সমস্যাসঙ্কুল। অনেক সময় সন্তানের মুখ চেয়ে বিবাদমান দম্পতি নিজেদের মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু উপন্যাসে বিলু এমনি এক নারী যে কন্যা লাবুর প্রতি অপত্যস্নেহ তার কোন সিদ্ধান্তকেই প্রভাবিত করতে পারেনি। স্ত্রী বিলু জীবনের আনন্দযজ্ঞের অংশীদার হতে গিয়ে স্বামী, কন্যার পাশাপাশি বিপর্যস্ত করে তুলেছে প্রীতমের পুরো পরিবারকেই। তবু ইচ্ছাশক্তির মন্ত্রে শক্তিমান হয়ে প্রীতম যেন সর্ববন্ধন মুক্তির দিকে নীরব যাত্রা করেছে। আর বাবা মায়ের প্রেমহীন সম্পর্কের মাঝে পড়ে ভবিষ্যতের problem child হবার প্রবল সম্ভাবনা নিয়ে লাবু থেকে যায় নীরব।

আমাদের সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত সম্পর্ক হল সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহের সম্পর্ক। বিশেষত সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসাকে আমরা absolute মনে করে থাকি। কিন্তু আধুনিক যুগে এই পরম পবিত্র ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার মধ্যেও কীভাবে স্বার্থপরতা, হীন ষড়যন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে তারই প্রমাণ আমরা পাই লাবুর প্রতি বিলুর উদাসীনতা এবং সজলের সাথে তৃষার সম্পর্কের নতুন মেরুকরণের মধ্য দিয়ে। সন্তানের প্রকৃতি স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির ফলে স্ত্রীর গ্রন্থিবিশেষ থেকে এমন এক ধরনের রসক্ষরণ হয় যা সন্তানের মধ্যে তাদের সদগুণগুলোকে পুষ্ট হতে সাহায্য করে। অপরদিকে তার মনে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণার ভাব থাকলে যে রসক্ষরণ হয় তা দোষগুলোকেই পুষ্ট করে। তৃষার শ্রীনাথের প্রতি শ্রদ্ধাহীন উদাস মনোভাব শ্রীনাথকে যেমন দগ্ধ করেছিল তেমনি শ্রীনাথের শোচনীয় পরিণতি এবং নিজের জন্মরহস্য নিয়ে

প্রশ্নকাতর সজল ধীরে ধীরে মিথ্যাচারী, নির্মম ও হৃদয়হীন এক সমাজবিরোধী যুবকে পরিণত হবার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। মায়ের অনুগত সজলের ধীরে ধীরে শ্রীনাথের সকাশে উজ্জ্বল অবস্থানে তৃষা বুঝে যায় একদিন তার মৃত্যু এই সজলের হাতেই হবে। বাঙালি মধ্যবিত্ত মায়ের এই নির্মম পরিণতির আশঙ্কা গ্রীক নাটকের ট্র্যাজিক পরিণতির চেয়ে কম হৃদয়বিদারক নয়।

বস্তুত ভালমন্দ সবকিছুতেই আছে। আজকের সমাজের যে কোন সার্থকতা নেই একথা বলা যায় না। আর প্রাচীন সমাজেরও যে কোন কুফল ছিল না তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি তো এ সমাজেরই দান। জনৈক সমালোচকের মতে ''নারী স্বাধীনতার এই হলো Objective পথ। অর্থাৎ বাইরের বাঁধন, সমাজ ও ধর্মের বাঁধন ভেঙে মানুষকে স্বাধীন পথে চলার স্বাধীনতা দেওয়া। তাঁর বহুতর সম্ভাবনাকে রূপায়িত করতে দেওয়া, পুষ্পিত বিকাশ সাধনে সহায়তা করা। কিন্তু এই বাহ্য স্বাধীনতা দিলেই, সমাজের বাঁধন ভাঙলেই তার অন্তরাত্মা মুক্ত হলো না। চাই Subjective সাধনাও। তার জন্যে দরকার অন্তরাত্মার স্বচ্ছন্দগতির যা অন্তরায় তাকে অপসারিত করা আধ্যাত্মিক মুক্তি। ধর্মের বাঁধন ভেঙে অধ্যাত্মের মুক্তি। শুধু সমাজের যান্ত্রিক বিধান থেকে নয়। নিজের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা। বাইরের বাঁধন ভাঙা হলো অন্তরের বাঁধন, অহংবোধ, স্বার্থ, লোভ আসক্তি আর নিম্নতর বৃত্তি রয়ে গেল— এই অবস্থায় নারীর শুধু বাহ্য মুক্তি এলে নারীপুরুষের মিলন শুভ সুন্দর মঙ্গলময় হবে না কখনোই। নারীর এই অন্তরমুক্তি না হলে বাহ্য মুক্তি আনবে কেবল বন্ধনহীন ব্যভিচার।''[৫৮] সাম্প্রতিককালের এই ভয়াবহ প্রবণতাতেই শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মানব জমিন' উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

(ঙ) 'পার্থিব'

সাহিত্য সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের অনুসরণে বলা যায় — ''বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে যদি সামগ্রিকভাবে আমরা দেখি তাহলে তার মধ্যে একটি জটিলতা আমরা দেখতে পাব। জন্মাবধি মধ্যবিত্ত সমাজবিত্ত ও মর্যাদার দিক থেকে, শিক্ষা ও সুযোগ সুবিধার দিক থেকে উঁচুনিচু নানা স্তরে বিভক্ত। স্তরগুলি কঠিনভাবে রুদ্ধদ্বার এমন নয়, নিচু থেকে উঁচুতে ওঠার দৃষ্টান্ত অনেক মিলবে, তাহলে ক্রমিক স্তরভাগ বেশ সু-উচ্চারিত। এর মধ্যে উপরের দিকের স্তরগুলির স্বার্থ এবং মানসিকতা সব সময় নিজের স্তরের স্বার্থ ও মানসিকতার সঙ্গে হুবহু মিলবে না। সাংস্কৃতিক পার্থক্যও অনেকখানি। একজন রামমোহন রায় কি রাধাকান্ত দেব, কিংবা রামকমল সেন, কিংবা প্রসন্ন কুমার ঠাকুর শিক্ষা সংস্কৃতির মর্যাদার যে স্তরে অধিষ্ঠিত, অফিসের বা ব্যবসাকুঠির একজন কেরানি, একজন শিক্ষক অথবা টোলের পণ্ডিত, একজন দোকান কর্মচারী অথবা সাময়িক পত্রের সাংবাদিক কিংবা

স্বল্প আয়ের চিকিৎসক সেই স্তরের সন্ধানই জানে না। দিনে দিনে মধ্যবিত্তের যতই সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে ততই মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র যদিও প্রচ্ছন্ন-ভারকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে। ঔপনিবেশিক শিক্ষার বিস্তার এবং ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা বিশ শতকের শুরু থেকেই ভার কেন্দ্রের ভিন্নতাকে ক্রমশ স্পষ্ট ও প্রখর করে তুলেছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির নীচের দিকের যে বৃহৎ এলাকায় ক্রমবর্ধমানভাবে দুর্যোগের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে নিম্নমধ্যবিত্ত যেরকম মন্দা ও বেকার সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, বাস্তবক্ষেত্রের নৈরাশ্য, বিক্ষোভ, পরাজয় ক্রমেই যে তার মধ্যে একটি চরমতা অভিমুখী মানসিকতার জন্ম দেবে এটা সহজেই বোঝা যায়। নীচের দিকের বিক্ষোভ উপরের স্তরকে তেমনভাবে স্পর্শ করেনি।"[৫৯] বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্তর বিন্যাসের এই নতুন স্বরূপটি কিছুটা হলেও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'পার্থিব' উপন্যাসে।

সনাতন ঐতিহ্যবাহী স্বাদেশিকতার প্রেক্ষিতে উপন্যাসে বর্ণিত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও অসীম উদারতা ও সব পেয়েছি মানসিকতার পরিচয় রেখেছে। ফলে তারা উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতাকে ছাড়িয়ে সমাজজীবনে দৃষ্টান্তমূলক চরিত্র হিসাবে একটা সুউচ্চ স্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। ছিন্নমূল মানুষ বিষ্ণুপদ সারা উপন্যাসে কোথাও তার ভিটেমাটি হারানোর বস্তুগত ক্ষতিতে মূহ্যমান নয়। কেবল মাত্র পূর্ববাংলায় ফেলে আসা তার পুরানো দিনের স্মৃতি, মা মাটির সঙ্গে আত্মিক অনুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবার যন্ত্রণা তাকে পীড়িত করে। তাই পুত্র কৃষ্ণজীবন পূর্ববঙ্গে তার ভিটা থেকে একটি আম্রপল্লব এনে দিলে ''বিষ্ণুপদ ঘুরে ফিরে গিয়ে আম্রপল্লবটা দেখে। শুকিয়ে আসছে। তা হোক। ওটার গায়ে যেন পূববাংলার আকাশ, বাতাস, মাটির রস, গন্ধ, গাঁয়ের ধুলো সব লেগে আছে। আম্রপল্লবটা হাতে নিয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকে বিষ্ণুপদ। নয়নতারাকে বলে, হ্যাঁ গো এটা পুঁতলে কি গাছ হবে? .... বলে দিলে কৃষ্ণ সেই বাড়ি থেকে একটা গাছের চারাও আনতে পারত। ... মনটা বড় উচাটন।"[৬০] বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ব্যাপক প্রসার এবং তার প্রভাব স্বরূপ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির নীতি নৈতিকতা ভুলে অর্থের পিছনে ধাবমান জীবনের গতিপরায়ণতাকে আত্মস্থ করে ভোগবাদী হয়ে ওঠার প্রচলিত রীতি এই শ্রেণিকে প্রভাবিত করে না। এরা আবদ্ধ থাকে সামন্ততান্ত্রিক বাংলার ছায়াসুশীতল তরঙ্গহীন গ্রামজীবনের নীতি নৈতিকতার মধ্যে। ফলস্বরূপ স্বল্পে সন্তুষ্টতা এই শ্রেণির মানুষের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই অর্থউপার্জনের জন্য অনৈতিক কাজে নিযুক্ত রামজীবনকে সঠিক পথের দিশা দেবার জন্য ''বিষ্ণুপদ ছেলের দিকে চেয়ে বলে এই যে আতা দেখছিস, বিচিতে ভরা, গিজ গিজ করছে বিচি। বিচি ফেলে আতার মাখনটুকু খেতে হয়। তাই না? মানুষের জীবনটাও তেমনই মেলা বিচি। ওসব বাদছাদ দিয়ে তবে খেতে হয়। বাঁকাপথ নিবি কেন?"[৬১] কন্যা

বীণাপাণিকেও তিনি অবৈধ ডলারের লোভ ত্যাগ করে সৎ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের পরামর্শ দেন। নিম্নমধ্য বাঙালির এই জীবনদৃষ্টি ধনতন্ত্র সুলভ নয়। এ যেন ভিক্টোরিয় যুগের শান্ত সুশীতল নিঃস্তরঙ্গ জীবন ভাবনা প্রসূত বলে আমাদের মনে হয়।

আধুনিক সভ্যতার সাজিয়ে তোলা জীবন প্রতারিত করে তুলতে পারেনি বিষ্ণুপদর স্ত্রী নয়নতারার জীবনকেও। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের ঈশ্বরী পাটনির মতো নারীরও যেন একমাত্র কামনা 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।' সংসারের ছোট গণ্ডি ও বিষ্ণুপদর মতো সৎ বিবেচক স্বামী এতেই সন্তুষ্ট সে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ভোগের উন্মাদনায় প্রমত্ত না করে এক সুচিন্তিত ভিত্তিতে সংযত এবং সমুন্নত করবার যে সাধনা শীর্ষেন্দু তাঁর সাহিত্য জীবনে গ্রহণ করেছিলেন নিম্নমধ্যবিত্ত নারী নয়নতারা লেখকের সেই সাধনার অবলম্বন। আদর্শ পরিবার উন্নত সমাজের ভিত্তি। আবার আদর্শ মানুষই গঠন করে আদর্শ পরিবার। বর্তমানে রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির এবং প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতি মানুষের জীবনে সুস্থতা আনতে পারেনি। অর্থনৈতিক, শিল্পনৈতিক এমনকি গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা এখন দেশে দেশে প্রসারিত। কিন্তু ব্যক্তি পরিবার ও সমাজগত পরিকল্পনার অভাবে ঐসব পরিকল্পনা সভ্যতাকে সংকটমুক্ত করতে পারেনি। তাই সংকটমুক্ত সভ্যতার স্বপ্নে মগ্ন লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে বিষ্ণুপদ নয়নতারার মতো অ-পার্থিব চরিত্র সৃষ্টি করে বাঙালি পরিবারের পারিবারিক মাধুর্যটুকু ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। যদিও কৃষ্ণজীবনের মতো লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কাছেও চরম বাস্তবতাটা অজানা নয়। বাস্তবে আসলে ''কোনও সম্পর্কই আর বেঁধে রাখতে পারছে না মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে। এ বড় ভাগের সময় এল। বিষ্ণুপদ আর নয়নতারাদের আর পাওয়া যাবে না দুনিয়াতে। তারা হারিয়েই যাবে বুঝি।''[৬২] বিষ্ণুপদ নয়নতারাদের হারিয়ে যাওয়াটাই আজকের দুনিয়ার চরম সত্যি। আর তাদের জায়গা দখল করে বামাচরণ শ্যামলীর মতো স্বার্থান্বেষী, নির্লজ্জ কর্তব্যহীন মানুষরা। তাই বিষ্ণুপদর মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই ''বামাচরণ চেঁচাচ্ছিল, বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞেস করে দেখ, দোতলাটা বাবা আমাকে দিয়ে গেছে কি না। দেখ জিজ্ঞেস করে। বাবা নিজের মুখে বলেছে আমি মরলে তুই দোতলাটা নিস। বামার বউ গলা মিলিয়ে বলল আমরা তো আর বলতে যাইনি। উনি নিজের মুখেই বলে গেছেন।''[৬৩] লালসার এই নিরাবরণ বহিঃপ্রকাশ সমকালীন যুগবাস্তবতার ফটোগ্রাফি। ধনতন্ত্র থেকে যতই আমাদের সমাজ উন্নত ধনতন্ত্রের দিকে যাত্রা শুরু করেছে ততই ব্যক্তির মধ্যে জন্ম নিয়েছে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার পন্থা প্রতিযোগিতার প্রচলিত প্যাটার্নগত শতাব্দীর শেষের দিকে ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসার মনোভঙ্গিও দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে। সকলের অগোচরে অতিদ্রুত একটি সামাজিক

বিপ্লব ঘটে গেছে। উপন্যাসে বামাচরণ, শ্যামলী সেই বিপ্লবেরই চিহ্ন বহন করে। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা চরম লালসার রূপ নিয়ে যাদের মস্তিষ্ক বিকৃতির সূচনা করেছে।

আশাবাদী লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বামাচরণ, শ্যামলীকেই সমাজের একমাত্র চরম সত্য বলে মেনে নিতে পারেননি। তাই বিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়িত সমাজে পিতৃভক্তি মাতৃশ্রদ্ধা যখন সমাজের প্রায় লুপ্ত প্রায় অঙ্গে পরিণত হয়েছে, তখন রামজীবনের অসীম পিতৃভক্তির নমুনা বিপন্ন সমাজ জীবনকেপ্রাণদায়ী অক্সিজেন সরবরাহ করেছে। দাদা কৃষ্ণজীবনের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত রামজীবন ব্যর্থতার আত্মগ্লানি ভুলে থাকার জন্য অসামাজিক কাজে লিপ্ত হলেও পিতামাতার প্রতি ভক্তি প্রবণ মানসিকতা তার অন্যতম সামাজিক গুণের পরিচায়ক হয়েছে। নিমাইয়ের কাছে তার সহজ স্বীকারোক্তি ''বড়দা কত বড় মানুষ সে তো জানো, আমার বড় হিংসে হয় বড়দাকে। বিদ্যেয় তো ছাড়াতে পারব না, তাই পয়সায় ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। আর এই দুনিয়ায় পয়সা করতে গেলে তো সাদা রাস্তায় হয় না। ... জাতও গেল, পেটও ভরল না।''[৬৪]

পেট ভরাতে গিয়ে জাতের কথা ভাবেনি রামজীবনের বোন বীণাপাণিও। তাই সে বিষ্ণুপদকে বলে ''কলি যুগে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোন ধর্ম আছে বলো! ধর্ম ধুয়ে কি জল খাবো, ... ধর্ম ধরে বসে থাকলে কোথায় তলিয়ে যেতাম তার ঠিক নেই।''[৬৫] দরিদ্র পিতার কন্যা দরিদ্রের গৃহবধূ বীণাপাণি যখন অর্থের প্রয়োজনে সংসারের গণ্ডি অতিক্রম করে বাইরের জগতে যখন পা রেখেছে তখন সকল সামাজিক বন্ধনই তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছে। টাকাও পেশাগত জীবনে প্রতিষ্ঠার মোহ তাকে চালিত করেছে। প্রতিদিনের অর্থনৈতিক সংকটে গ্লানিময় দিনযাপনের তিক্ত পূর্ব অভিজ্ঞতা তাকে আরও বেশি লোভী, অধার্মিক করে তুলেছে। তাই অবৈধভাবে পাওয়া ডলারকে সে জঁকের ধনের মতো রক্ষা করেছে। এই ডলারকে অবলম্বন করেই নিম্নবিত্তের সীমা অতিক্রম করে উচ্চবিত্তের সীমায় প্রবেশের স্বপ্ন দেখেছে বীণাপাণি।

প্রাচীনকালে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিল সমাজ। ব্যক্তি মানুষ সমাজের অন্যতম একক। তাই ব্যক্তির ভাব ভাবনা অনিবার্যভাবেই প্রতিফলিত হয় সমাজ পরিকাঠামোয়। সাধারণত পিতামাতার জীবনদর্শন উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তায় পুত্রকন্যাদের মধ্যে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের জীবনের গতিময়তা এবং বিশ্বায়নের খোলা হাওয়া বাঙালি সমাজের চিরাচরিত এই রীতিতে কুঠারাঘাত করল। তাই বিষ্ণুপদ নয়নতারার ছেলেমেয়েরা স্বল্পে সন্তুষ্ট নয় বরং ভোগবাদ দ্বারা তাড়িত হয়ে বিপথগামী। সর্বগ্রাসী ভোগবাদ যখন দানবীয় মূর্তিতে আমাদের সমাজে আবির্ভূত তখন উপন্যাসে নিমাইয়ের মতো সৎ, ধার্মিক, আদর্শপরায়ণ চরিত্র ন্যায়নীতি হীনতার মরুভূমি রূপ সমাজে অমৃত সুধা দান করে যেন মরুদ্যান সৃজন করেছে। প্রচলিত রীতির

কখনো কখনো ব্যতিক্রমও ঘটে। তাই লোভ লালসায় বিপর্যস্ত পরিবার সমাজের ধ্বংস স্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো নিমাই চরিত্রের আত্মপ্রকাশ।

দু-মুঠো ভাত ও মোটা কাপড়ের আকাঙ্ক্ষায় নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য নিমাইয়ের বাবা মার কাছে সতীত্বের প্রচলিত ধারণা গেছে বদলে। তাই সংসার চালানোর প্রয়োজনে বীণাবাণি যাত্রাদলে নাম লেখালে ''শাশুড়ি গোপনে তাকে এমন কথা ও বলল, মনিবকে খুশি রেখো। মনিব অন্নদাতা ভগবান। শরীর যদি এঁটোকাঁটা হয়ে পড়ে তো গঙ্গায় ডুব দিয়ে এলেই সব পাপ ধুয়ে ফর্সা।''[৬৬] নারীর শরীর শুদ্ধিকরণ সম্পর্কে নিমাইয়ের মায়ের এই ভাবনা প্রয়োজনের তাগিদে বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনদর্শনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনকেই প্রতিফলিত করে। কিন্তু সমাজ জীবনের এই পরিবর্তন প্রভাবিত করেনি নিমাইকে। পৌরাণিক চরিত্র নিমাই সন্ন্যাসের মতো তারও ধর্মে অবিচল বিশ্বাস। তাই নিমাই কাহিল মুখে বীণার দিকে চেয়ে থেকে বলে, ''কিসে পাপ হয়, কোথা থেকে কোন ফুটো দিয়ে কর্মফল এসে ঢোকে তা কে জানে! আমি বোকাবুদ্ধির মানুষ। ... রাস্তায় পয়সা পড়ে থাকলেও আমি কখনও কুড়োই না। পয়সা বড় মারাত্মক জিনিস।''[৬৭] পয়সা সম্পর্কে এই বোধ তাকে নিম্নমধ্যবিত্তের শ্রেণিগত অবস্থান থেকে অনেক উপরে স্থান দিয়েছে। স্বল্পে সন্তুষ্ট এই ব্যক্তির কাছে টাকা কেবল খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার অবলম্বন মাত্র, জীবনের অভিমুখ নির্ণায়ক নয়। তাই লালসা মুক্ত নিমাই বলে, ''এর বেশি চাইতে নেই। আমার তো এতোই মনে হয় রাজা গজা হলাম বুঝি। বড়োবুড়ি (নিমাইয়ের বাবা মা) চাট্টি খেতে পাচ্ছে, আমারও দুবেলা জুটে যাচ্ছে। আমার মত মানুষ আর কী চায় রে? এটুকু জুটলেই হল।''[৬৮]

অপরদিকে নিম্নমধ্যবিত্তের দৈনন্দিন গ্লানিময় জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে মধ্যবিত্তের সীমায় অনুপ্রবেশের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল শিক্ষিত বেকার যুবক চয়ন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামবাংলার ভূমিহীন মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যে শহরমুখী যাত্রা শুরু হয়েছিল বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে তা আরও গতিময়তা লাভ করে। এবং দেশভাগ পরবর্তী বাংলায় মানুষের এই প্রবণতা চরম রূপ লাভ করে। ফলে ধীরে ধীরে বাংলার গ্রামগুলি একদিকে যেমন জনশূন্য, নির্জন প্রান্তরে পরিণত হয় তেমনি কোলকাতার মতো নগরগুলি ভাগ্যান্বেষী মানুষের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে ভূমিহীন মানুষ সামান্য ভাতকাপড়ের বন্দোবস্তের প্রয়োজনে ইংরেজ সরকারের কেরানি হবার প্রয়োজনে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু কোলকাতার মত নগরীগুলির জনবিস্ফোরণ সেই তুলনায় চাকুরির অপ্রতুলতা রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাকে ভয়াবহতার পর্যায়ে নিয়ে যায়। শুধু একটি চাকুরির বন্দোবস্ত করে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষী চয়নদের প্রতিমুহূর্তে লড়াই করে জিতে নিতে হয় বেঁচে থাকার জন্য

প্রয়োজনীয় ভূমি (চাকুরি)। কিন্তু এপিলেপটিক চয়নের দৈহিক প্রতিবন্ধিকতা তার শিক্ষা তার যোগ্যতাকে প্রায় মূল্যহীন করে দিয়ে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠার জায়গায় পৌঁছতে দেয়নি তাকে। কিন্তু চয়নের শিক্ষা, রুচি তার মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক অদ্ভুত বোধের। আর এই বোধই শ্রেণিগতভাবে প্রায় একই অর্থনৈতিক স্তরে অবস্থান করলেও বামাচরণ, বীণাপাণির থেকে তার সামাজিক অবস্থানকে এক অন্যমাত্রা দিয়েছে। এপিলেপটিক বেকার যুবক চয়নের বিবর্ণতায় মোড়া, বিষণ্ণতায় ঘেরা পৃথিবীতেও রুগ্ন মায়ের জন্য তার হৃদয়ে একটা স্থান থেকে যায়। তাই স্বার্থপর, হৃদয়হীন দাদা অয়নকে দেখে চয়নের মনে হয়েছে ''বিছানায় ওই যে কখনো হাড়ের অস্তিত্ব নিয়ে পড়ে আছে মা, আজও নির্লজ্জের মতো পৃথিবীতে মা হয়ে জন্মানোর গুণগার দিচ্ছে এ মা অয়নের নয়। অয়নরা মায়ের পেটে জন্মায় না। অয়নদের মা বলে কেউ থাকে না।''[৬৯] হেমাঙ্গ ঝুমকীর উচ্চমধ্যবিত্ত সুলভ রোমান্টিক প্রেম বিলাস আনন্দিতাকে ঘিরে চয়নের রোমান্টিক জীবন আকাঙ্ক্ষাকে প্রলোভিত করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়ন উত্তর বাস্তব পরিস্থিতি চয়নদের শেখায় তাদের মতো বেকার নিম্নমধ্যবিত্ত যুবকদের স্বপ্ন দেখাও মানা। শুধুমাত্র ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আপন ইচ্ছাকে প্রতিমুহূর্তে হত্যা করাই সমাজে এই শ্রেণির মানুষের অনিবার্য পরিণতি।

বিত্তগতভাবে সমাজে যাদের অবস্থান মধ্যম সাধারণত তারাই মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসাবে পরিগণিত হয়। যদিও বিত্তগত এই অবস্থান স্থায়ী কোন অবস্থা নয়। কোন কারণে অর্থের আগমন বাড়লে সাধারণ মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্তের স্তরে উন্নীত হতে পারে, আবার কোন অর্থনৈতিক সংকট এই শ্রেণিকে নিম্নমধ্যবিত্তের স্তরে অবনীত করতেও পারে। বিত্তগত অবস্থানের এই অনিশ্চয়তা সমাজে এই শ্রেণির মানুষের মধ্যে স্বার্থসর্বস্ব চিন্তাধারা ক্রমশ অস্বাভাবিকতা, অবক্ষয় ও বিকারগ্রস্ততার রূপ নিয়ে দেখা দেয়। উপন্যাসে বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারী মনীশের স্ত্রী অপর্ণা মনীশ অসুস্থ হবার পর গভীর চিন্তায় মগ্ন ''মনীশ কি চলল? মনীশ চলে গেলে অপর্ণার কি করে চলবে?''[৭০] তার আরও চিন্তা ''কিন্তু মনীশ যদি না ফেরে? মনীশ না ফিরলে তার পিছনে চালচিত্রের মতো বহুজাতিক সংস্থাটিও মুছে যাবে। এককালীন কিছু টাকা গছিয়ে দিয়ে কোম্পানি তাদের সম্পূর্ণ ভুলে যাবে। আর তখনই কি শুরু হবে টাকার প্রতিশোধ?''[৭১] অপর্ণার এই ভবিষ্যৎ চিন্তা যা সাধারণ মধ্যবিত্তসুলভ হীনস্বার্থপরতার পরিচয়, তা অপর্ণা ও 'মানব জমিন' উপন্যাসের বিলুকে একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করে। চিন্তাবিলাস, অল্পে কাতর হয়ে ওঠা এই শ্রেণির মানুষের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই এক কাপ চা বাড়তি হলেও যেমন অপর্ণা চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে তেমনি আবার মনীশের অসুস্থতায় সে তার চারপাশে কেবল অন্ধকার দেখে। অপরদিকে বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনা, সমাজকল্যাণকামী কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে মনীশের মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত যুবকরা

জীবনের পথ চলা শুরু করলেও মধ্যবয়সে এসে 'আমরা দুই ও আমাদের দুই' এর সুখী গৃহস্থের সীমায় নিজেদের বদ্ধ করে নেয় নিজেদের। যদিও এই মধ্যবিত্ত পুরুষরাই কিন্তু উনিশ শতক থেকে সমস্ত জাতীয় আন্দোলনের প্রধানতম অংশীদার। প্রবন্ধকারের ভাষায় 'আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের নান্দীকার এঁরাই।' বিশ শতকের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে পর্যন্ত তারই প্রমাণ আছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও তার পরবর্তীকালের নানা ঘটনাপ্রবাহ সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এনেছে নানা পরিবর্তন। তাই বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের বাঙালি মধ্যবিত্ত পুরুষ মনীশের সমাজ পরিবর্তের ভাবনা আপার বিপ্লবী মনোভাবকে উৎসাহ দানের মধ্যেই সীমিত হয়ে যায়। তার শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা গৃহী মনীশকে আর বিপ্লবী মনিশ হয়ে উঠতে দেয় না।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে গোদের মতো সমাজের একটি অংশ অর্থনৈতিকভাবে ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। ''এরাই মধ্যবিত্ত সমাজে এলিট সম্প্রদায় বলে পরিচিত হয়। মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন কোলকাতা শহরকেন্দ্রিক এই সম্প্রদায়ের মানুষের ভোগ্যপণ্যের বেহিসেবী ব্যক্তিগত বিলাসিতা একটি অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পোষা বেড়াল-বাঁদরের বিয়েতে লাখ টাকা উড়িয়ে দেওয়া, বাগানবাড়িতে বয়স্য বারাঙ্গনা আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে আমোদ করা, লখনউ বারাণসীর বাইজীর নাচের আসরে মোহর আর অলঙ্কার প্যালা দেওয়া, উৎসবপার্বণে বিবাহে শ্রাদ্ধে অকাতরে টাকা খরচ করা দীনদরিদ্র অনাথ আতুর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘটা করে দানধ্যান করা— এইসব অতীতের আভিজাত্যের নিদর্শন বর্তমান কলকাতায় দেখা যায় না এবং এগুলি আর আভিজাত্যের লক্ষণ বলে গণ্যও হয় না। আধুনিক নাগরিক আভিজাত্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রীক এবং সমাজ ও সমষ্টির সঙ্গে তার সংযোগ কেবল আত্মপ্রচারের মাধ্যমে। তাই ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্যের বৈচিত্র্য ও বিলাসিতা প্রদর্শনই আধুনিক আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।''[৭২] তাই উপন্যাসে যখন ''এক সপ্তাহে পর পর দু-দুটো প্রেমে পড়ে গেল হেমাঙ্গ। একটি সৌরচুল্লি এবং অন্যটি ইলেকট্রনিক ওয়াটার ফিল্টার। চুরি করে নয়, লোক ঠকিয়ে নয়, নগদ দামে কেনা''[৭৩] তখন হেমাঙ্গর শ্রেণি চরিত্র সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো হেমাঙ্গকে কখনো ভাতকাপড়ের চিন্তা করতে হয়নি। পেশাগতভাবে সফল এই ব্যক্তি রঙিন ফানুসের মতো জীবনের উপর দিয়েই সন্তরণ করেছে। রামজীবনের গ্লানিময় জীবনের যন্ত্রণা, এপিলেপটিক বেকার যুবক চয়নের বেঁচে থাকার লড়াই, নিমাইয়ের আদর্শে অবিচল থাকার প্রচেষ্টা এইসব এলিট সম্প্রদায়ের মানুষদের কোনভাবেই স্পর্শ করে না। ককটেল পার্টি, সুন্দরী যুবতীকে ঘিরে রোমান্টিক প্রেমভাবনা সর্বপরি 'মুড' পরিবর্তনের জন্য মেকী গ্রামপ্রীতি এদেরকে কুয়োর ব্যাঙে পরিণত করেছে। সমকালীন সমাজ রাজনীতি এদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি। প্রভাবিত

করতে পারে না দুঃখী, দরিদ্র মানুষের হাহাকারও। তাই হেমাঙ্গর দিদি চারুশীলা অবলীলায় বলতে পারে ''আমার সামনে গরিব কথাটা উচ্চারণ করবি না কখনও। গরিব কথাটাই আমি সহ্য করতে পারি না। গরিবদের দু-চোখে দেখতেও পারি না।''[৭৪] কারণে অকারণে হাজার হাজার টাকা খরচ করতে এই মহিলা পিছুপা নন। আসলে উপন্যাসে আর্কিটেক্ট স্বামী সুব্রতর উপার্জিত অর্থের প্রভাব খাটিয়ে চারুশিলা তার চারপাশে মানুষজনদের নিয়ে একটা ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করেছে। যে জগতে সেই হত্তাকর্তাবিধাতা। উপন্যাসে কৃষ্ণজীবনের শিক্ষিতা স্ত্রী রিয়া উচ্চমধ্যবিত্তসুলভ অহমিকার বশবর্তী হয়ে কৃষ্ণজীবনের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে কৃষ্ণজীবনকেও। আত্মপ্রত্যয় ও অহমিকাবোধ সমাজের এই শ্রেণির মানুষদের বৃহত্তর সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা করেছে।

নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা উপন্যাসে গোত্রান্তরিত কৃষ্ণজীবন। জীবনজিজ্ঞাসায় কাতর চরিত্রের আত্মমগ্নতাই প্রধান হলেও তার মগ্ন চৈতন্যে উঠে এসেছে সুসংগঠিত সমাজের কল্পনা। যদিও উচ্চমধ্যবিত্তের বিলাসবহুল জীবনযাপন অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণজীবনকে যেমন প্রলোভিত করে না তেমনি আবার নিম্নমধ্যবিত্তের গ্লানিময় জীবনের রোজনামচা তাকে সেইভাবে ব্যথিত করে না। তাই বেকার যুবক চয়নের চাকুরির প্রয়োজনীয়তার কথা সে সহজেই বিস্মৃত হয়ে যায়, বোন বীণাপাণিকে সৎ থাকার পরামর্শ দেয় কিন্তু স্বচ্ছল জীবনযাপনের কোন পথ দেখাতে পারে না। নিজের পরিবারের সদস্য, নিকটজনদের প্রতি কর্তব্যপালনে অক্ষম কৃষ্ণজীবনের পক্ষে কি সম্ভব বৃহত্তর সমাজের জন্য কোন কল্যাণকামী পদক্ষেপ নেওয়া? আমরা জানি, দেশবিদেশের উজ্জ্বল সেমিনার আর পশ্চিমে মেঘা পাবলিশারদের অপর্যাপ্ত ডলারের টান এড়িয়ে, কৃষ্ণজীবনের অন্তরে অভিলাষ আছে, একদিন সব ছেড়েছুঁড়ে গ্রামে এসে বাস করবার, তাতেই কৃষ্ণজীবনের মতো প্রবাসী চিত্তের অলস বেদনা বিলাসী ব্যক্তির সাধনার সমাপ্তি। গ্রামের মানুষরা যেমন তেমনিই থেকে যাবে। দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য যেমন তেমনি থেকে যাবে। চিরকালই বীণাপাণির মতো মেয়েরা অভাবের তাড়নায় যাত্রাদলের নটী হয়ে যাবে, ব্যর্থতার যন্ত্রণা তুলতে রামচরণের মতো পুরুষরা সমাজবিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়বে, আর লালসার তাড়নায় বিকৃতমস্তিষ্ক যুবকরা বামাচরণের মতো বিড়বিড় করতে থাকবে। কৃষ্ণজীবনদের দ্বারা না সমাজ না পরিবার কারও কোন আত্মিক বা অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বাঙালি মধ্যবিত্তের সমাজ বাস্তবতায় এই সত্যের স্বপক্ষেই প্রমাণ মেলে। উপন্যাসে কৃষ্ণজীবন সংক্রান্ত বাকি সব ঘটনা সৃজনশীল লেখকের নিছক কল্পনা বলেই আমাদের মনে হয়।

(চ) 'চক্র'

আত্মমগ্ন লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সমাজবাস্তবতা নয় ব্যক্তিত্বের সংকটই তাঁর উপন্যাসে প্রধান উপজীব্য। জীবন-অস্তিত্বের ভাবনায় চরম নিরাশ্রয়তা বোধ তাঁর সৃষ্ট বেশিরভাগ চরিত্রের পিঠ দেয়ালে ঠেকিয়ে দেয়। তবে ব্যক্তিজীবন তো কোনক্রমেই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়, নয় মানুষে মানুষে সম্পর্কের ব্যবধানকে বাড়ানোর ভিত। রাজনীতি, প্রেম, ন্যায়নীতি, সমকালীন অর্থনীতি এই সমস্ত কিছুকে চতুর্দিককে গ্রাস করে ব্যক্তি হয় পূর্ণাঙ্গ। আর ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিসত্তার আত্মপ্রকাশের প্রেক্ষাপটে সমকালীন সমাজজীবনের চালচিত্রও স্পষ্টতা পায় তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে। ২০০৫ সালে প্রকাশিত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'চক্র' উপন্যাসেও সমাজ বাস্তবতার ছবি উঠে এসেছে চরিত্রের হাত ধরেই।

আমরা জানি ''সভ্যতা যত এগোয় নগরজীবন তত কাছের হয়ে আসে। গ্রামজীবনের একেবারে অবলোপ ঘটে না, তবে নগর-সভ্যতা অবশ্যই গ্রামজীবনের অভ্যন্তর স্বভাবকে ধীরে ধীরে গ্রাস করতে থাকে। এটাই প্রাগ্রসর সভ্যতার যেনবা এক অর্থে নিয়তি-নির্দেশ। সভ্যতার রসদ যোগানোয় যেমন বিজ্ঞানের ভূমিকা গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি গ্রামজীবনও নানাভাবে গভীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে। গ্রাম ও শহরের দেয়া-নেয়া-তেই সমাজ তথা সভ্যতার পূর্ণরূপ। কিন্তু সভ্যতা নগরজীবনের তিলোত্তমা স্বভাবে শেখায় বা অবধারিত করে গ্রামজীবনকে তার ধীর-বদলের ভূমিকা গ্রহণে। বিশ শতকীয় যান্ত্রিক সভ্যতা এক বিংশ শতাব্দীতে জাতিকতা থেকে আন্তর্জাতিকতায় তার দিগন্ত বিস্তার করে। তাই একবিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গ্রাম ও শহরের দূরত্ব কমতে থাকে। নগরজীবন বিলাস আনে, গ্রাম জীবন তৈরি করে মাটির টান। নগরজীবনে মোহ থাকে, থাকে অবক্ষয়, গ্রামজীবন হয় শান্ত, স্নিগ্ধ, চিরন্তন ঐতিহ্যের পীঠস্থান।''[৭৫] কিন্তু কালের অমোঘ বিধানে গ্রামীণ স্নিগ্ধ জীবনের অন্তরে নগরসভ্যতার যে ক্রমানুপ্রবেশ ঘটছে তারই বিশ্বস্ত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'চক্র' উপন্যাসে।

উপন্যাসে বলাকা লেখকের সৃষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ নারীচরিত্র। যে নারী সর্বংসহা হয়ে ধরিত্রীর মত অনন্ত সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়, প্রত্যাশাহীন সেবায় নিয়ত থেকে আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারকে পালন ও বহন করে চলে। স্বামী এই নারীর কাছে কেবল প্রেমাস্পদ নয় দেবতুল্য। তাই স্বামীর প্রতি সশ্রদ্ধ আনত মানসিকতা গৌরহরি বলাকার দাম্পত্য সম্পর্ককে মসৃণ ও সুখময় করে তুলেছে। ''খেয়ালি পুরুষটির সব সিদ্ধান্ত উচিত অনুচিত আজও বুঝতে পারে না বলাকা। মন মানতে চায়নি তবু গৌরহরি যা বলেছেন তা বরাবরই মেনে নিয়েছেন বলাকা। মানুষটা তাঁর চেয়ে পনেরো বছরের বড়, ইয়ারবন্ধু তো নয়।''[৭৬] আধুনিক যুগোচিত নারীস্বাধীনতা,

আত্মসম্মান বোধ প্রভৃতি সমাজ বিপন্নকারী প্রসঙ্গ প্রভাবিত করেনি বলাকাকে। ফলে তার সেবা ও সংস্রব গৌরহরিকে আদর্শপরায়ণতা ও সমাজ সেবায় উদ্যোমী করে তোলে। তাই ''সতেরো জন ফৌজদারি মামলার আসামি। খালাস হতে হতে সন্ধে পেরিয়ে গেল যখন, তখন তাদের বাড়ি ফেরার বাস নেই। ট্যাকেও নেই পয়সা। গৌরহরি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বর্ধমান থেকে তাদের সোজা নিজের বাড়িতে এনে তুললেন। সতেরোটা উপোসি ষণ্ডামার্কা গেঁয়ো লোক। এমনিতেই তারা ভাতের পাহাড় এক চোপাটে উড়িয়ে দেয়। সেদিন তারা দুনো খিদে নিয়ে যে পরিমাণ ভাত খেল তা টিকিট কেটে দেখার মতো দৃশ্য। সতেরোটা মুখের ভাত ডাল জোগাতে বাড়ির গিন্নির কী হাল হল তা ফিরেও দেখেননি গৌরহরি। ওটা দেখা যেন তার কাজ বা কর্তব্য নয়।''[৭৭] দায়িত্বশীল নারী ও কর্তব্যনিষ্ঠ, আদর্শপরায়ণ পুরুষ এই দুইয়ের মেলবন্ধনই সার্থকতা আনে মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের দাম্পত্য সম্পর্কে। সার্থক হয়ে ওঠে সুপ্রজননও যা সমাজের একান্ত কাম্য। তাই চরম অবক্ষয়, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার যুগেও গৌরহরি ''যে সুরে চাকরবাকরদের হুকুম করতেন সেই একই সুরে নিজের দুই ছেলেকেও হুকুম করতেন। ছেলে দুটো দিশেহারা হয়ে বাপের হুকুম তামিল করতে ছুটত। ফুলের মতো সুন্দর দুটো মেয়েও কদাচিৎ আসকারা পেত তাঁর কাছে। ছেলেপুলেদের নাড়াঘাটাও করতেন না বড় একটা।''[৭৮] তবুও মেজাজি, অহংকারী, দাপুটে এবং খানিকটা আত্মসর্বস্ব ও অত্যাচারী পুরুষটি এক গভীর আন্তরিকতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল তার পরিবারের সদস্যদের, তাই ভাতকাপড়ের চেয়েও আজকের সমাজের মানুষ যখন বড্ড বেশি অভাববোধ করে ভালোবাসার তখন গৌরহরির মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের দীর্ঘ হাহাকার ভরা আর্তনাদ দেখে মহিম চৌধুরির মতো আমাদেরও মনে হয় ''মেলে না মেলে না, হিসেব কিছু মিলতে চায় না।''[৭৯] হিসেবও আরও গরমিল হয়ে যায় যখন গৌরহরির ''ফিজিক্সের কৃতী অধ্যাপক ছেলে ঝন্টু বাপের বুক থেকে হঠাৎ মুখ তুলে ছোট ভাইকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠল, এই মন্টু, দেখ দেখ, বাবার বুকে যেন হার্টবিট পাচ্ছি। কেমন শব্দ হচ্ছে বুকের মধ্যে। বাবা নিশ্চয়ই মরেনি। ফকিরবাবার জল-পড়া খাইয়েছি, মরতে পারেই না।''[৮০]

পিতামাতার সংযমী, আদর্শনিস্ট সামাজিক জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত পারুলকে সুস্থ সামাজিক জীবনযাপনে উৎসাহিত করেছে। প্রেমিক অমলের কামুকতা ও অসংযমী সামাজিক জীবনযাপন পারুলকে অমলের কাছ থেকে দূরে স্থাপন করেছিল। পারুলের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ''তোমার (অমল) সংযম নেই, তুমি বেহাল হয়ে যাও, মেয়েরা তাদের পুরুষকে ওরকম দেখতে ভালোবাসে না।''[৮১] অমলের আচরণের প্রতিবাদে সে বিবাহ করে জ্যোতিপ্রকাশ গাঙ্গুলিকে। এবং আধুনিকা শিক্ষিতা নারী পারুল স্বামীর কর্মযজ্ঞে অংশীদার হয়ে সার্থকভাবে স্বামীর সহধর্মিনী হয়ে ওঠে এবং

সুখী দাম্পত্য তথা সুস্থ সামাজিক জীবনযাপনের মধ্যেই সার্থকতা অনুভব করে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের মনে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ নারীর মডেলটি প্রতিভাত হয়েছে এই উপন্যাসে বলাকা ও পারুল চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ঔপন্যাসিক স্পষ্ট ও ঋজুভাবে না হলেও, কার্যত তিনি সর্বংসহা সীতার মডেলটিই রাখতে চেয়েছেন। নারী হবে সেবাপরায়ণা, ধৈর্যশীলা, ক্ষমাশীলা, তার থাকবে ত্যাগ আর আত্মাহুতির আদর্শ। কিন্তু এইটেই পুরো চিত্র নয়। সমাজ যে নারীর এই ত্যাগব্রতের দিকে তাকিয়েও দেখ না, সবসময়ই এদের উপর অত্যাচার করে, সব সময়ই পুরুষদের প্রতি নির্লজ্জ পক্ষপাত দেখায়। শীর্ষেন্দু উপন্যাসে সমাজের এই একদেশদর্শিতাও আভাসিত হয়েছে। তাই প্রসঙ্গক্রমে ভাই বিজুকে পারুল বলে ''এরকম ভালবাসা আর আনুগত্যই তো তোরা পুরুষেরা চাস। ..... পুরুষেরা সব সময়েই কলোনিয়াল প্রভুদের মতো মেন্টালিটির হয় কেন রে? তারা রাজা, মেয়েরা প্রজা।''[৮২] পুরুষ-নারীর মধ্যে রাজা-প্রজার সম্পর্ক সচেতন লেখক শীর্ষেন্দুর দ্বারাও সমর্থিত হয়নি। আসলে পুরানো ধ্যানধারণার কোনো কোনটির প্রতি সচেতন, অর্ধচেতন এবং মগ্ন শ্রদ্ধাভক্তি, রক্তের মধ্যে নিহিত অতীতের সম্মোহন তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রকে অনেক বেশি সহনশীল, দায়িত্বশীল করে তুলেছে যা কখনো কখনো বাস্তবতার সীমা লঙ্ঘন করে যায়। অতীতের আদর্শের প্রতি মুগ্ধতা আর বর্তমান সমাজের বাস্তবতার প্রতি দরদী হৃদয়ের স্বীকৃতি, শীর্ষেন্দুর মনের এই দুয়ের দ্বন্দ্বই বাঙালি সমাজে নারীর পরিকল্পনায় সীতার কল্যাণী আদর্শের প্রতি লেখককে আকৃষ্ট করেছে।

অশুভ প্রবৃত্তি নিয়ে অপূর্ণ যে মানুষ তাকে নিয়ে পূর্ণ ত্রুটিহীন মানবসমাজ গড়া সম্ভব নয়। ''এমনকী আমাদের সমস্ত আচার-আচরণ, সমস্ত কর্মধারাকে যদি বাইরে থেকে শিক্ষা দিয়ে আইনের শাসন দিয়ে, সমাজনীতি রাজনীতির যান্ত্রিক বিধি-বিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাহলে একটা নিখুঁত যন্ত্রমানবের সমাজ নির্মাণ করা যাবে মাত্র, কিন্তু পূর্ণবিকশিত জীবন্ত মানুষের সমাজ সৃষ্টি করা যাবে না।''[৮৩] 'The Life Divine' গ্রন্থে শ্রী অরবিন্দের গভীর এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন মেলে 'চক্র' উপন্যাসের অমলের জীবনাচারণের মধ্যে। শ্রী অরবিন্দ তাঁর অনন্যসুলভ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, মানুষের জীবনের যত বিকৃতি, যত স্খলন, তার মূলে অন্যতম কারণ যৌনকামনা। সুতরাং ''মানুষের পূর্ণ দেবায়ন সাধন করার জন্য এই বৃত্তির মূলে কুঠারঘাত করা দরকার। এই জন্যে প্রথমে এদের ভোগের দ্বারা নিস্তেজ করে শেষে সংযমের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা প্রকৃতি সমাজ থেকে একে ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপে এর আর কোন স্থান নেই তাই চলে যাবার আগে 'নতুন বল সঞ্চয়' করে সমাজনীতিতে আজ যৌনবৃত্তির কুলপ্লাবন এসেছে।''[৮৪] তাই প্রেমিকা ধর্ষণ করার পর অবলীলায় অমল বলতে পারে—''ওই একটা

শরীরের ঘটনা কি আমায় এত বড় অপরাধ?..... তবে এটুকু বলে যাই, আজকের দুনিয়ার ওসব কেউ গায়ে মাখে না। ওটা তুচ্ছ ব্যাপার।"[৮৫] কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই অমলের ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তি অমলকে এক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। সেই প্রশ্ন মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমি কে? এই মৌলিক প্রশ্নে জর্জরিত, অবসাদগ্রস্ত অমলের "কেবলই মনে হচ্ছিল চারদিক থেকে যেন একটা হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। .... এ সেন্স অফ লস। গ্রেট লস।"[৮৬]

এই সেন্স অফ গ্রেট লসের অনুভূতিই তার সত্তাকে সমাজ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক নির্জন অনুভবের জগতের বাসিন্দা করে তুলেছে। তার এই বিচ্ছিন্নতা বোধের গভীরতাই দাম্পত্য জীবনে মোনালিসার সাথে তার সম্পর্কে দানা বাঁধতে দেয়নি। ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্র বলেছেন— "উন্নয়ন আর সুপ্রজনন এইতো বিয়ের মূল। যেমন তেমন বিয়ে করে করিস নাকো ভুল।"[৮৭] ব্যক্তির কাছে সমাজের প্রধান চাহিদা হল সুপ্রজনন। কারণ সুপ্রজনের মাধ্যমেই সুস্থ সমাজ সুগঠিত হয়। যেমন তেমন বিয়ে করে অমল তার জীবনে দ্বিতীয় সামাজিক ভুলটি করেছিল। পারুল দ্বারা প্রত্যাখিত অমল অহং আর হীনমন্যতার দ্বারা চালিত হয়ে মোনালিসাকে বিবাহ করলেও সুকেন্দ্রিক জীবনযাপন তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। গাছ যেমন শিকড় দিয়ে মাটি থেকে তার বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে পুষ্পে পল্লবে বিকশিত হতে থাকে মানুষও তেমনি তার পরম্পরাগত রীতিনীতি বিশ্বাসকে আত্মস্থ করে ঐতিহ্যের অনুসরণ করেই সুকেন্দ্রিক সুষ্ঠু জীবনযাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের প্রভাবে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনযাপনের ধারা গেছে বদলে। বিশ্বায়ন পরবর্তী পৃথিবীতে ভোগবাদের ব্যাপক প্রসারের সাথে সাথে সমাজে মূল্য পেতে লাগল টাকা আর প্রচুর টাকার মালিকরা। সততা, শ্রদ্ধাশীলতা, আনুগত্য এসব গুণাবলী সমাজ থেকে অবলোপ পেতে থাকলে তার পরিবর্তে অর্থ উপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধি, মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর সমাদর শুরু হল। সমাজের সর্বস্তরে মেধার কদর মেধাসম্পন্ন যুবকদের অহংকারী করে তুলল। যার থেকে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে স্বেচ্ছাচারিতা, গুরুজনদের প্রতি অশ্রদ্ধার মানসিকতা। তাই উপন্যাসে অমলের পিতা মহিম চৌধুরীর উক্তি "ছেলেমেয়েদের ভয় পেতাম। সব থেকে বেশি ভয় পেতাম তোকে। ..... পরীক্ষায় ভাল ফল-টল করলি। সে এত ভাল যে এ বংশের কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।..... লোককে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শিখলি। তখন তোকে এত ভয় হত যে কথা-টথা বিশেষ কইতে পারতাম না। মানুষ যখন গৌরব করার মতো কিছু করে তখন তার অহং বেসমাল হয়ে ওঠে কিনা।"[৮৮] মহিম চৌধুরী এই মন্তব্যেরই সমর্থন মেলে অমলের স্বীকারোক্তিতে "যখন ক্লাসে ফাস্ট হতে শুরু করলাম। অনেক নম্বর পেতাম, মাস্টারমশাইরা

প্রকাশ্যে প্রশংসা শুরু করলেন, পাঁচজন ধন্য ধন্য করতে লাগল, তখনই একদিন অহংকার চলে এল। খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার বুঝলে? বাইরের লোক ততটা টের পেত না। কিন্তু মনে মনে আমি ক্লাসমেটদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা করুণা করতে শুরু করি। কোনও মাস্টারমশাই কখনও কিছু ভুল করলে মনে মনে অনুকম্পা বোধ করতাম, অশ্রদ্ধার ভাব আসত।.... আমি বাবাকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে শুরু করি।"[৮৯] যে সমাজ, যে সংস্কৃতি মানুষকে শেখায় 'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমহতপঃ' সেই সংস্কৃতিতে লালিত সন্তান যখন পিতাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে তখন তার পদস্খলন ঠেকাবে কে?

উপন্যাসে বহুদেশ ঘুরে, বহু নগর শহরে বসবাস করেও ঘাসের কণায় শিশির বিন্দু দেখার আকাঙ্ক্ষা অমলকে উৎসমুখী করে তুলেছে। আসলে তার অন্তরে লালিত হয়েছে সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি। যৌবনে তার বুদ্ধি ও মেধার প্রখর্য তাকে সঠিকভাবে চিনতে না দিলেও পরিণত বয়সে সেই সংস্কৃতির প্রতি অমলের গভীর শ্রদ্ধায় ভাব জন্মেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে অপরাধবোধ। তাই অনুশোচনায় দগ্ধ অমল বলেছে ''আমার মনে হয় এতকাল যে অমল বেঁচে আছে সে ভুল অমল। ভুল তার মেধা, তার লেখাপড়া, তার চাকুরি, তার বিয়ে, সব ভুল, ওটা আসল আমি নয়।.... আমি আমার আসল আমিকে খুঁজে বেড়াই পারুল। তোমার কাছে পাগলামি মনে হবে হয়তো। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার ভিতরে একটা বিস্ফোরণ হবে একদিন। তারপর আসল আমির জন্ম হবে।"[৯০]

চক্রাকারে জীবনের পথ পরিক্রমা করার পর যে বোধের জায়গায় এসে অমল স্থিতু হতে চেয়েছে ঠিক সেই জায়গা থেকেই যাত্রা শুরু করেছে তার কন্যা সোহাগ। ঐতিহ্যকে অস্বীকার নয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে তার মধ্যে। নাগরিক জীবনের অতি নাগরিক বৈদগ্ধতা তাকে যেমন বিপথগামী করে তোলেনি। তেমনি গ্রামজীবনের সংস্পর্শে আসার পর গ্রাম্য কুসংস্কারকেও সে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়নি। বিদেশে বসবাসকালে এক অভিনব সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করে সোহাগ। 'টুপারী টাইপ' জাতীয় উপজাতির দ্বারা অপহৃত সোহাগকে তারা শিখেয়েছিল তাদের জীবনদর্শন। তারা বলে ''আদিম মানুষেরাই ঠিকভাবে বাঁচতে জানত। তারাই টের পেত বেঁচে থাকার গভীর আনন্দ। মানুষদের জড়ো করো, সভ্যতার কৃত্রিমতা থেকে দূরে নিয়ে যাও, বাঁচতে শেখাও এক মুক্ত জীবনে।"[৯১] এই সমাজের পুরুষ মানুষরা সূর্য অস্তাচলে যাওয়ার আগে শিকার করা শেষ করতো পুরুষ বা ছেলেরা গ্রামের চারা বা কৃষির জন্য জমি তৈরি করতো এবং বাড়ি তৈরি করার সরঞ্জাম ও জ্বালানী কাঠ জোগাড় করতো। মহিলাদের কাজ ছিল তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, খাদ্যবস্তু তৈরি করা, ফলমূল আহরণ করা। সকলে

তাদের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করতো এবং এক সাথে জড়ো হয়ে একটি বিশেষ পানীয় গ্রহণ করতো। প্রকৃতিকে গভীরভাবে অনুভব করা এবং সরাসরিভাবে প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার জন্য এই সমাজের মানুষরা নগ্ন থাকত। উন্মক্ত প্রকৃতির প্রাঙ্গণেই মলমূত্র ত্যাগ করতো। এরাই সোহাগকে শিখিয়েছিল 'Trying to fell the earth' প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ সোহাগের মধ্যে অতি প্রাকৃতবোধের জন্ম দিয়েছে। তাই "সোহাগের পৃথিবী আর সকলের মতো নয়। যা দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, অনুভব করা যাচ্ছে সেখানেই সোহাগের পৃথিবী শেষ নয়। তার জগৎ আরও অনেক গভীর। চারিদিককার শূন্যতার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে কত রহস্য, কত দীর্ঘশ্বাস, কলকাকলি, কত হারিয়ে যাওয়া কথা, তার তো মনে হয় পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম মানবীর শ্বাসবায়ু আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে তার চারদিকে।"[৯২] আধুনিক সভ্যতার দ্বন্দ্বদীর্ণ প্রেক্ষাপটে ভোগলিপ্সু মানুষ যখন স্বার্থের কারণে ভাই ভাইয়ের রক্তে স্নাত হতে উদ্যত তখন প্রকৃতিপ্রেমের এমন নমুনা সত্যিই বিরল। সমকালীন সমাজজীবনের বিপন্নতা সম্পর্কে নির্বিকার শীর্ষেন্দু আত্মমগ্ন হয়ে গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও গ্রাম্য সমাজের প্রতি অনুগত থেকেছেন। আর তার সেই নির্বিকল্প আনুগত্যের প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসের সমাজভাবনার মধ্য দিয়ে।

'চক্র' উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রই অন্তরে গ্রামকে লালন করেছে। কেবল মাত্র সোহাগের মা মোনালিসা ছাড়া। সহানুভূতিশীল লেখকের হৃদয়বত্তার কারণে সেও সেরকম কোন রূঢ়তা নিয়ে উপন্যাসে উপস্থিত নয়। কেবল আধুনিক যুগসুলভ সহনশীলতার অভাব, মানিয়ে নেবার অক্ষমতা অমল ও মোনালিসার পরিবারকে অ-সুখী পরিবারের নিদর্শন করে তুলেছে। নারীর সহনশীলতা, উদারতা, মমত্ববোধের প্রতি প্রবল আস্থাশীল লেখক সুসমাজ গঠনের জন্য মোনালিসার মতো নারীদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হবার জন্য আশাবাদী। তাই আধুনিকা, শিক্ষিতা মোনালিসারও 'মডিফিকেশন' ঘটিয়েছেন লেখক। স্বামী অমলের প্রতি সহানুভূতি প্রবণ হয়ে ওঠা, বর্ধমানে অমলের গ্রামের বাড়িতে স্বেচ্ছায় দিনযাপনের ইচ্ছা প্রকাশ আসলে মোনালিসা চরিত্রের এই পরিবর্তনকেই সূচিত করে।

১৯৪৭ দেশভাগের প্রেক্ষিতে বাঙালির আত্মনুসন্ধান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট প্রয়াসের এক নতুন অধ্যায় রচিত হয় বাংলার সমাজ ইতিহাসে। 'চক্র' উপন্যাসে ছিন্নমূল রসিক বাঙাল ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সহজ প্রবণতা থেকেই বর্ধমানের অদূরবর্তী গ্রামে জমি জায়গা কিনে বসবাস শুরু করে। শহরের জনকল্লোলে ব্যক্তির নিজস্ব Identity হারিয়ে যায়। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সান্নিধ্য মেট্রোপলিটন শহরে প্রায় বিরল। যার জন্যপ্রিয় জন্মভূমির গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, প্রতিবেশীদের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার স্মৃতিকে অবলম্বন করে রসিক সাহা

কোলকাতায় পেশানির্ভর প্রতিষ্ঠিত জীবনের গণ্ডি অতিক্রম করে গ্রামে মাটিতে আশ্রয় খুঁজেছে। বর্ধমানের গ্রামের মাটিতেই রসিক বাঙাল তার ফেলে আসা পূর্ববঙ্গে গ্রামজীবনকে খুঁজে পেতে চেয়েছে। চেয়েছে নতুন মাটিতে তার ছিন্নমূল সত্তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে কিন্তু কেবলমাত্র বিষয়সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে বিবাহিত রসিক বাঙালের গ্রাম্য নারী বাসন্তীকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত একবিংশ শতাব্দীর সমাজ বাস্তবতার সীমাকে লঙ্ঘন করে যায়। একবিংশ শতাব্দীর বাঙালি পাঠক সমাজ হতবাক হয়ে যায় যখন রসিক বাঙালের এই অবৈধ বিবাহ উপন্যাসে লেখক কল্পিত বাঙালি সমাজে আদর্শ পুরুষ চরিত্র গৌরহরি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সমর্থিত হয়। ''গৌরহরি বললেন, মানুষের প্রয়োজন বুঝেই বারবার আইন তৈরি হয়েছে, সেরকমই হওয়া উচিত। মানুষের প্রয়োজনে কাজে না এলে আইন বোঁদা জিনিস রসিক ফুর্তি করার জন্য তো আর একটা বিয়ে করছে না। তার সম্পত্তি দেখাশোনার জন্যই দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রয়োজন। প্রাচীনকালে সামাজিক প্রয়োজনেই মানুষকে এরকম বিয়ে করতে হয়েছে। উদ্দেশ্য খারাপ না হলে আমি অন্তত দোষ দেখছি না।''[৯৩] তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে এ কোন সমাজ, ও কোন সময়ের কথা এখানে উচ্চারিত হয়েছে। আমাদের মনের বিস্ময়ের সীমাকে আরও বাড়িয়ে দেয় রসিক সাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী বাসন্তীর মুখের স্বর্গীয় হাসি। রসিক সাহার দ্বিতীয় সংসার সামলাতে ব্যস্ত বাসন্তী যখন বলে ''সংসার মানেই তো কাজ। কত কী সামলাতে হয়। গোরু, বাছুর, হাঁস, মুরগি, বেড়াল, কুকুর, মানুষজন। কার দিকে নজর না দিলে চলে বলো!''[৯৪] তখন তার এই মন্তব্য পারিবারিক গণ্ডিতে তার সুখী, তৃপ্ত জীবনাচারণের দিকটিকেই ইঙ্গিত করে। আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমরা ভাবি একবিংশ শতাব্দীর সমাজ বাস্তবতায় পারুল, মোনালিসার মতো নারী বাঙালি সমাজে দুর্লভ না হলেও বাসন্তীর মতো নারীর অস্তিত্ব সত্যিই কি দুর্লভ নয়।

অতিথিপরায়ণতা, শ্রদ্ধাশীলতা, ভোজন রসিকতায় পূর্ববঙ্গের হারিয়ে যাওয়া গ্রাম্য ঐতিহ্যকেই রসিক সাহা এ পার বাংলায় গ্রামজীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। গৌরহরির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা ধীরেন কাষ্ঠের প্রতি অতিথিপরায়ণতা সর্বপরি জিজিবুড়ির প্রতি তার সহানুভূতিশীল উদার মানসিকতা পূর্ববঙ্গীয় সমাজের ঐতিহ্যগত সম্পন্নতার দিককেই প্রকাশ করে। ১৯৯২ সালে GATE যুক্তি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বায়ন ও আধুনিক বাঙালি সমাজের খোলনোলচে বদলে যাওয়া রসিক সাহার মতো 'মোটা দাগের' (অনুভূতির সূক্ষ্মতাহীন) ব্যক্তিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই সে অবলীলায় অমলকে বলতে পারে ''ঝঞ্ঝাট কি আমারও কিছু কম গেছে মশায়? মার ধইরও খাইছি কিন্তু ডিভোর্স করি নাই। বিয়া করা বউ তারে ছাড়ুম ক্যান কন? জজ সাহেব রায় দিলেই হইব? তা হইলে তো বিষয়সম্পত্তি ছাইড়্যা ল্যাংটা চ্যাংটা হইয়া বিবাগী হইয়া যাইতে হয়। বউও আমার

সম্পত্তি, পাজি হউক, ব্যাচাইল্যা হউক, তারে ছাড়ুম ক্যান?"[৯৫] বিষয়সম্পত্তি এইসব মানুষের কাছে প্রাণ। সমাজ, সংসার, যুগধর্ম সবকিছু তার মতো মানুষের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।

বিশ্বায়ন পরবর্তী দুনিয়ার যুগধর্ম নয় বাঙালি সমাজের শাশ্বত নারীধর্ম উপন্যাসে সন্ধ্যা চরিত্রের আচরণকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। এখানেই কথাকার শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের স্বাতন্ত্র্য। তিনি যুগের মধ্যে থেকেও যুগগত অবক্ষয়কেই একমাত্র সত্য বলে অঙ্গিকার না করে ডুবুরির মতো অনুভূতির গহনে ডুব দিয়ে সন্ধ্যার মতো নারীচরিত্র তুলে আনেন তার উপন্যাসে। ফলে তার রচিত উপন্যাসে আমরা গ্রামবাংলার পূর্বপ্রচলিত পারিবারিক জীবনের নিটোল রূপটিই দেখতে পাই। স্বামী পরিত্যক্তা নারী সন্ধ্যা স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব নয় বরং তার জীবনের অহেতুক বিড়ম্বনার কারণ খুঁজতে গিয়ে এই নারীর মনে জন্ম নিয়েছে হীনমন্যতা। একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক পর্বে নারী জাগরণ শুধু সাংস্কৃতিক সীমায় আবদ্ধ না থেকে যখন নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দাবি করে তখন সন্ধ্যা ভাবে ''যদি ইংরেজিতে হড়বড় করে কথা কইতে পারতুম, যদি তুখোড় বুদ্ধি থাকত তাহলে হয়তো সেই লোকটা অমল তাড়িয়ে দিতে সাহস পেত না।"[৯৬] সন্ধ্যার কাছে এ সত্য অজ্ঞাত নয় যে ''শ্বশুরবাড়ি ফেরত মেয়েদের কেউ ভাল চোখে দেখে না। সবাই ভাবে, নিশ্চয়ই চরিত্রের দোষ দিল, না হলে ঝগড়ুটে বজ্জাত, নইলে গোপন রোগ আছে, না হলে বাঁজা, নইলে তাড়াবে কেন। এদেশে যত দোষ তো মেয়েদের ঘাড়েই চাপে কি না।"[৯৭] অর্থাৎ আমাদের সমাজব্যবস্থারই গোড়ায় গলদ। তবুও শাশ্বত বাঙালি সমাজব্যবস্থা সন্ধ্যাকে করে তুলেছে সংস্কার আচ্ছন্ন তাই সন্ধ্যা বলে ''আমি তো হিন্দুমতে সধবা। বর তো দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। আবছা করে হলেও এখনও রোজ সিঁদুর পরি। বামুনের মেয়ে তো, তাই এখনও ওসব ঘুচিয়ে দিতে পারিনি।"[৯৮] একবিংশ শতাব্দীর সমাজ বাস্তবতায় স্বামী পরিত্যক্ত নারী সন্ধ্যার পতিব্রতা হয়ে নারীধর্মে অবিচল থাকা যে প্রশ্নাতীত নয় এ সত্য লেখক শীর্ষেন্দুর কাছেও অজানা ছিল না। তাই তিনি জবাবদিহির সুরে সন্ধ্যার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন ''সমাজের নিয়ম কি সব সময়ে সকলের ক্ষেত্রে খাটে? মানুষের মনের ভিতরটা কত কী আছে, বাইরে থেকে টের পাওয়া যায় না।"[৯৯]

মানুষের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত গ্রাম্যনারীর এই ভিতর বাইরের তফাত অনুভব একান্তভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীর দান। গ্রাম দিয়ে নগর ঘেরার পরিকল্পনাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের দুনিয়ার মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত। কিন্তু তার পরিবর্তে বাস্তবে যা হয় তা হল নগর ধীরে ধীরে তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে গ্রামকে নিজের অঙ্গীভূত করে নেয়। নগর সভ্যতার এই সর্বগ্রাসী রূপ দেখে নাভিশ্বাস ওঠে গ্রাম্য সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের। কবির

''দাও ফিরে সে অরণ্য। লহ এ নগরী'' সুলভ মানসিকতা নিয়ে তিনি তার কল্পনা বিশ্বে সৃজন করেন 'চক্র' উপন্যাসের গ্রাম সমাজ। বিজুর মতো তরুণ এই গ্রাম সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। গৌরহরি চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরি বিজুর মধ্যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যথার্থ মিশ্রণ ঘটেছে। গ্রাম সুলভ ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা ও শহর সুলভ আধুনিক মনস্কতা এবং পুরানো ধ্যানধারণার মধ্যে থেকেও পুরনো ধ্যানধারণা ছিন্ন করার প্রয়াস আসলে একবিংশ শতাব্দীর সর্বময় অবক্ষয়ের পটভূমিতে বাংলার গ্রাম সমাজকে এক নতুন পথের দিশা দেখায়। আধুনিক যুগের কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'ছন্নছাড়া' কবিতায় বর্তমান যুবক যুবতীর মূর্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ওদের কিছু নেই। থিত নেই ভিত নেই রীতি নেই নীতি নেই/ আইন নেই কানুন নেই বিনয় নেই ভদ্রতা নেই/ শ্লীলতা-শালীনতা নেই।''[১০০] তখন প্রায় সমসাময়িক শীর্ষেন্দুর উপন্যাসে বিজুর জবানবন্দি ''আমাকে ছেলেবেলা থেকে শেখানো হয়েছে মেয়েদের সঙ্গে সম্মানজনক দূরত্ব রাখতে হয়। মাখামাখি করতে নেই। বড় হয়ে আমি গাঁয়ের যুবসমাজের অভিভাবক। স্বনিযুক্ত অভিভাবকই ধরে নাও। আমি কি পারি মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টি নস্টি করতে?''[১০১] তখন উৎসাহপ্রবণ পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে আজকের যুগে 'নেই রাজ্যের' বাসিন্দা যুবসমাজের মধ্যে বিজুর অবস্থান কবি বর্ণিত 'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনার কথাকেই কি স্মরণ করিয়ে দেয় না।'

লেখক বা কবির কল্পনা নয় একেবারে গ্রামবাংলার মাটির গন্ধ গায়ে মেখে উপন্যাসে উঠে এসেছে ধীরেন কাষ্ঠ ও তার পরিবার। যৌবনে বয়সোচিত কামনার তাড়নায় প্রতারিত ধীরেন কাষ্ঠ সারাজীবন অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হতে হতে নিজের আত্মশুদ্ধি ঘটিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর অতিনাগরিক বৈদগ্ধতায় যৌনতা, অবৈধকাম যখন A part of life এ পরিণত তখন ধীরেন কাষ্ঠের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনাবোধ বর্তমান যুগজীবনের পক্ষে জাগ্রত বিবেকের কাজ করেছে। গ্রামজীবনের প্রেক্ষাপটে ধীরেন কাষ্ঠের দার্শনিক সত্তার বিকাশ ও সৌন্দর্য পিপাসু মনের আত্মপ্রকাশ আসলে লেখকের গ্রাম প্রীতিকেই দ্যোতিত করে।

তবুও জনৈক সমালোচকের সাথে একমত হয়ে আমরাও বলতে পারি যে — ''লক্ষণীয় রকমের পক্ষপাতের ঝোঁক শীর্ষেন্দুর গ্রাম সমাজভাবনা ও নগরজীবন ভাবনার মধ্যে লক্ষ করা যায়। আসলে গ্রামের যে সবই ভাল আর শহরের যে সবই খারাপ তা তো নয়। গ্রাম অন্যদিক থেকে যত ভালই হোক গ্রাম তো কুসংস্কারের কেন্দ্র, মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতারও দূর্গ। তেমনি অন্যদিক থেকে যত খারাপই হোক নগর, নগরই তো সংস্কৃতিরও কেন্দ্র, জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র, জাতীয় জীবনের সমস্ত কর্মপ্রয়াসের উৎস। আজ গ্রামের যা অবস্থা তাতে অনায়াসেই বলা যায় যে, গ্রাম যদি হয় স্থবিরত্বের প্রতীক, তো নগর হল গতির প্রতীক। তাই দরকার গ্রামকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে

নগরায়িত করে তোলা, ঠিক যেমন দরকার নগরে অনেক বেশি গ্রামীণতার সঞ্চার করা, দুয়ের খাদ্য খাদক সম্পর্কের বদলে সুস্থ, শোষণমুক্ত, যুক্তিগ্রাহ্য সম্পর্ক গড়ে তোলা।"[১০২] তেমন কোন পরিকল্পনা লেখক শীর্ষেন্দুর মাথাতে আছে বলে তাঁর উপন্যাসগুলির সমাজ ভাবনায় অন্তত প্রতিফলিত হয় না।

সূত্রনির্দেশ

১। রবীন্দ্র রচনাবলী, চর্তুদশ খণ্ড, ১২৫তম রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৮, বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ, পৃঃ ১৮১।

২। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৮, পৃঃ ৪৩২।

৩। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র সমগ্র, প্রথমখণ্ড, 'ঘুণপোকা', আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮ পৃঃ ২২।

৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ৪০।

৫। তদেব, পৃঃ ৪০।

৬। তদেব, পৃঃ ৩৪।

৭। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, বিপন্নতা থেকে স্বস্তির সন্ধানে, পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পৃঃ ২১৮।

৮। বীরেন্দ্র দত্ত, বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃঃ ৩৭৪।

৯। তদেব, পৃঃ ২১৩।

১০। তদেব, পৃঃ ২৩৩।

১১। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, বিপন্নতা থেকে স্বস্তির সন্ধানে, পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পৃঃ ২১৮।

১২। তদেব, পৃঃ ৬৮।

১৩। তদেব, পৃঃ ৭৯-৮০।

১৪। রামেশ্বর শ, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, নভেম্বর ২০০৮, পৃঃ ৭১।

১৫। তদেব, পৃঃ ৮৭।

১৬। তদেব, পৃঃ ২৬৭।

১৭। তদেব, পৃঃ ২৬৮।

১৮। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ২৮৭।

১৯। তদেব, পৃঃ ১৫১।

২০। তদেব, পৃঃ ১৫১।

২১। তদেব, পৃঃ ১৫২।

২২। তদেব, পৃঃ ১৫২।

২৩। তদেব, পৃঃ ৭২।

২৪। তদেব, পৃঃ ৭৪।

২৫। তদেব, পৃঃ ৭৫।

২৬। তদেব, পৃঃ ১০১।

২৭। ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূলচন্দ্র, 'নারীর নীতি', সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, পৃঃ ১২।

২৮। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র প্রথম খণ্ড, 'পারাপার', আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৮, পৃঃ ১৬৯।

২৯। তদেব, পৃঃ ১০৮।

৩০। তদেব, পৃঃ ১৫৮।

৩১। ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্র, নারীর পথে, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, পোঃ সৎসঙ্গ বিহার, পৃঃ ৫৩।

৩২। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড 'দূরবীণ', প্রথম সংস্করণ ২০০৯, পৃঃ ৩৭২।

৩৩। তদেব, পৃঃ ৩৭১।

৩৪। তদেব, পৃঃ ৩৭২।

৩৫। তদেব, পৃঃ ২৫১।

৩৬। তদেব, পৃঃ ২৮০।

৩৭। তদেব, পৃঃ ২৯৭।

৩৮। তদেব, পৃঃ ২৯৭।

৩৯। তদেব, পৃঃ ৪৪৯।

৪০। রামেশ্বর শ, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, নভেম্বর ২০০৮, পৃঃ ৪৬২।

৪১। তদেব, পৃঃ ১৮২।

৪২। তদেব, পৃঃ ১৮২।

৪৩। তদেব, পৃঃ ১৮১।

৪৪। তদেব, পৃঃ ৩৭৬।

৪৫। তদেব, পৃঃ ৪২০।

৪৬। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, উপন্যাস সমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, 'মানব জমিন' আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ - ২০০৯, পৃঃ ২৮৬।

৪৭। তদেব, পৃঃ ৭২৮।

৪৮। তদেব, পৃঃ ৬৮২।

৪৯। তদেব, পৃঃ ৩০৬।

৫০। তদেব, পৃঃ ৪৩৫।

৫১। তদেব, পৃঃ ৫৪৩।

৫২। তদেব, পৃঃ ২৭৭।

৫৩। তদেব, পৃঃ ৪২৪।

৫৪। তদেব, পৃঃ ৭৬৬।

৫৫। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, বিপন্নতা থেকে মুক্তির সন্ধানে, পঞ্চাশের দশকের কথাকার, পৃঃ ২১২।

৫৬। তদেব, পৃঃ ৭৬৩।

৫৭। তদেব, পৃঃ ৭৬৩।

৫৮। রামেশ্বর শ, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, নভেম্বর ২০০৮, পৃঃ ৪৬২।

৫৯। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, পৃঃ ৩৭।

৬০। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'পার্থিব', আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ ২০০২ পৃঃ ৬৫৪।

৬১। তদেব, পৃঃ ২২৬।

৬২। তদেব, পৃঃ ৬৬০।

৬৩। তদেব, পৃঃ ৬৬০।

৬৪। তদেব, পৃঃ ২৭০।

৬৫। তদেব, পৃঃ ৩১৮।

৬৬। তদেব, পৃঃ ২৬।

৬৭। তদেব, পৃঃ ২৩৮।

৬৮। তদেব, পৃঃ ৩০৩।

৬৯। তদেব, পৃঃ ১৬৬।

৭০। তদেব, পৃঃ ২৮।

৭১। তদেব, পৃঃ ২৯।

৭২। বিনয়কুমার ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন, মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা-৭২, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃঃ ২১০।

৭৩। তদেব, পৃঃ ৯৪।

৭৪। তদেব, পৃঃ ১০০।

৭৫। রামেশ্বর শ, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, নভেম্বর ২০০৮, পৃঃ ৪৫৯।

৭৬। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, 'চক্র', আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ - মার্চ ২০০৬, পৃঃ ১১৩।

৭৭। তদেব, পৃঃ ৩৫।

৭৮। তদেব, পৃঃ ৩৬।

৭৯। তদেব, পৃঃ ৩৬।

৮০। তদেব, পৃঃ ৩৬।

৮১। তদেব, পৃঃ ১৫।

৮২। তদেব, পৃঃ ২০২।

৮৩। তদেব, পৃঃ ৪৬১।

৮৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-০৬, ১৩৯৪, পৃঃ ২৯৩।

৮৫। তদেব, পৃঃ ১৬।

৮৬। তদেব, পৃঃ ১৫২।

৮৭। ঠাকুর শ্রীশ্রী অনুকূল চন্দ্র, 'নারীর নীতি', সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, পৃঃ ১২।

৮৮। শীর্ষেন্দু মুখ্যোপাধ্যায়, 'চক্র' আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ - মার্চ ২০০৬, পৃঃ ৩৬৬।

৮৯। তদেব, পৃঃ ২২২।

৯০। তদেব, পৃঃ ৩০৫।

৯১। তদেব, পৃঃ ৩৯২।

৯২। তদেব, পৃঃ ৪৪৮।

৯৩। তদেব, পৃঃ ৪৬।

৯৪। তদেব, পৃঃ ২১৬।

৯৫। তদেব, পৃঃ ৩৭০।

৯৬। তদেব, পৃঃ ১৯২।

৯৭। তদেব, পৃঃ ৩৯২।

৯৮। তদেব, পৃঃ ৩৯৩।

৯৯। তদেব, পৃঃ ৫০১।

১০০। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সমগ্র, কবিতা, 'ছন্নছাড়া', গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সংস্করণ - ১৩৮১, পৃঃ ৩৪৬।

১০১। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় 'চক্র' আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৬, পৃঃ ১৯৮।

১০২। সত্যেন্দ্রনাথ রায়, বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃঃ ২৯৩।